বাস্তবিকা

শ্রীদিবাকর শর্ম্মা

১৩৯৬



পাঁচসিকা]

[আশ্বিন ১৩৩৮

রসাচার্য্য

পরশুরাম

করকমলেষু

১১৮১

বাস্তবিকা

দরদী

মাঝ গাঁয়ের রাখন মাসীর পত্র পাওয়া গেল। তিনি লিখিতেছেন, "বাবাজীবন, শ্রীমান্ হরিকুমারের খবর বার্ত্তাদি হইতে আজ একমাস বঞ্চিৎ আছি। বাবাজীউকে দেখিয়া আসিয়া আমাকে একখানি চিঠি লিখিবে। তোমার ধর্ম্মমাসীর মনের দুঃখ বুঝিয়া এ কার্য্যে গৌণ করিবানা ইত্যাদি।"

রবিবারের সকাল বেলাটা নিতান্তই মাঠে মারা গেল দেখিতেছি। শ্রীমান্ হরিকুমার শুনিয়াছি সম্প্রতি চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে বাসা করিয়াছেন। অনেকটা পথ, কাজেই সকাল সকাল বাহির হইলাম। রাখন মাসীর উপর রাগ হইতে লাগিল। তখনই বলিয়াছিলাম, ছেলেকে কারখানায় ভর্ত্তি করিয়া দিতে। তিনি গোঁ ছাড়িলেন না, ছেলে পড়ুক তিনি পৈতা কাটিয়া খরচ জোগাইবেন। ইহার পর বৎসর চারেক কাটিয়া গেল। হরিকুমার এখন কি পড়ে জানিনা, কিন্তু রাখনমাসী রীতিমত খরচ জোগাইয়া চলিয়াছেন শুনিয়াছি।

মেসের বাসা। নীচে বামুন ঠাকুরের কাছে খোঁজ করিয়া তেতলায় উঠিলাম। একটি ঘরের দরজার গায়ে দুটি গোলাপের ছবি আঠা দিয়া আঁটা, তাহার নীচে ফরাসীর মত বাঁকানো অক্ষরে লেখা আছে 'কুমার-কুঞ্জ'। ঘরে ঢুকিয়া একটু দাঁড়াইলাম। ঘরে কেহ নাই। এক পাশে মাটিতে বিছানা বিছানো, তাহার উপর রঙ্গীন, একখানা শীতল পাটি। টেবিলের উপর চায়ের বাটী, সিগারেটের টীন, নস্যদানী, ছবির এলবাম, ফাউণ্টেন পেন, খানকয়েক ফরাসী উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদ, পাঁচ সাত খানা খাতা, একটা যুগল পাখী চিত্রিত কফিকাপ তাহাতে দুধ আর একখানি প্লেটে থল্‌থলে আধসিদ্ধ ডিম ধূমায়মান। টেবিলের সম্মুখে দেয়ালে একটি স্ত্রীলোকের ছবি বাঙ্গালী উড়িয়া কি হিন্দুস্থানী বুঝিবার যো নাই, তাহার নীচেয় ফ্রেমে গোঁজা ছটি গোলাপ। ঘরের অন্য কোণে ষ্টোভ, কুকার, একজোড়া শ্লিপার, একজোড়া বাক-স্কিনের গ্রিসিয়ান, একজোড়া লাল ও এক জোড়া সবুজ নাগরা। দেয়ালের গায়ে নীল পেন্সিলে ছোট ছোট কবিতা। তারিখ সহ লেখা বলিয়া মনে হইল—ভালো করিয়া দেখিবার অবকাশ পাইলাম না। চটির শব্দে মুখ ফিরাইয়া দেখি শ্রীমান্ হরিকুমার—তাহার মাথায় এক ঝাড় চুল, আলু থালু, স্প্রিংয়ের চশমা জোড়া কারের সহিত বুকের উপর লম্বমান, গায়ে সবুজ পাঞ্জাবী, দৃষ্টি উদাস। উদাস দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া সে কহিল, "এসেছেন আপনি? ক'দিন থেকে আমারও মন বল্‌ছিল "আপনি আস্‌বেন। কতদিন দেখা হয়না বলুন তো? চার বচ্ছর, না? চারটী বচ্ছর? সুদীর্ঘ কাল কেমন কেটে গেল দেখতে দেখতে—বসুন।" আমি বসিয়াই ছিলাম; কহিলাম, "তুমি বোস। তুমি আছ কেমন

পুরোণো বাসাটা বদলেছ কতদিন ?" কে কহিল, "যতদিন থেকে সেণ্ট্রাল এভিনিউয়ের নাম বদলে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ হয়েছে। বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট আর চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কত তফাৎ ? তা নৈলে সে বাসাটাই কলেজের কাছে ছিল ; কিন্তু 'বেচু' কথাটা বল্‌তে কিংবা লিখ্‌তেই আমার গা শিউরে উঠত। তাই বাসা বদ্‌লেছি—" বুঝিলাম হরিকুমার কবি ও সুন্দরের উপাসক হইয়াছে। কহিলাম, "খুব কবিতা লিখছ বুঝি ? মাসীকে চিঠি দাওনি কেন ? তিনি কত দুঃখ করে চিঠি লিখেছেন—" হরিকুমার কহিল—"চিঠি দিইনি, সে কথা ভুল। হয়তো চিঠি লিখিছি ডাকে দিইনি ; নৈলে ডাকে দিইছি কিন্তু সাদা পোষ্টকার্ড।" একটু অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিলাম। সে কহিল, "আশ্চর্য্য হচ্ছেন আপনি হয়তো। কিন্তু জানেন স্বভাব আমার এই রকমই ছিল চিরটা কাল। গত বৎসর হিষ্ট্রিতে নম্বর পাইনি মোটেই, এমনি ধারা একটুখানি ভুলের জন্যে। স্কচ কুইন মেরীর কথা লিখতে গিয়ে—সে হতভাগিণী নারীর জন্য এমন ব্যথা বুকে বাজল আমার যে কবিতা ছাড়া আর কিছু লিখতে পাল্লুম না। একজামিনের খাতার পাতায় আখর দিয়ে গাঁথা একটা স্তবের মালা রেখে এলুম। সে সময় যদি লিখতুম শুধু শুষ্ক ইতিহাসের কথা, তবে আমার হৃদয়কে প্রতারণা করা হোত। কিন্তু সে মিথ্যা থেকে মনকে রেহাই দিলুম। ফেল করলুম, কিন্তু সেদিন যদি না গাঁথতুম সে ছন্দের মালা, তা হলে সুখ কিছুতেই হোত না আমার পাশ করেও।"

কহিলাম, "ঠিক বুঝ্‌ছি নে। কিন্তু তাই বলে মায়ের কাছে চিঠি না লিখে অনর্থক দুঃখ দিয়ে—"

হরিকুমার আমার কথা সমাপ্ত হইতে দিল না, মাথার চুলের ভিতর

সুদীর্ঘ নখযুক্ত আঙ্গুলগুলি চালাইয়া দিয়া কহিয়া উঠিল, "দুঃখ! দুঃখ!! ধরণীর বুকের এই নিরন্তর ব'য়ে যাওয়া দুঃখের স্রোতের মাঝে মায়ের দুঃখটুকু তো বুদ্বুদ—একটি বুদ্বুদ! কত দুঃখের ভার বইছি আমি বল্‌ব কি? এই সকাল আর সন্ধ্যা, এই সন্ধ্যা আর প্রত্যুষ সব এক তারে বাঁধা—দুঃখের তারে, বেদনার মূর্চ্ছনায়। মাঝে মাঝে অবাক্ হ'য়ে যাই নিজেই ধরণীর বিচিত্র বেদনার ভার ব'য়ে বেঁচে আছি কেমন ক'রে? এমন হ'য়েছে মনখানি যে সব তাতেই তার মর্ম্মকোষে ব্যথা ফুটে ওঠে ফুলের মত। শুন্‌বেন? সেদিন আস্‌ছিলুম ট্রামে! সাম্‌নের বেঞ্চে বসেছিল একটা মেয়ে, তার কোলের উপর খোলা একখানা ধারাপাত। আমি দেখছিলুম না শুধু সে মেয়েটিকে। আমি দেখছিলুম তার আট বছরের ওই দেহখানার মধ্যে আঠারো বছরের যে যৌবনটা আস্‌বে একদিন তাকে। সেই ভবিষ্যতের অতিথি, সেই দশ বছর পরের যৌবন—তার ব্যথা, তার জ্বালা, তার তৃষা অনুভব কর্চ্ছিলাম আমার নিজের বুকের মাঝখানটায়। মেয়েটি গাড়ী থেকে কিন্‌লে এক পয়সার চানাচুর। গাড়ী ছাড়তে ঠোঙ্গা থেকে তার চাট্টিখানি পড়ে গেল। বুকের মাঝখানটায় কেমন ক'রে উঠল আমার কি বল্‌ব! সেই কোলের উপর ধারাপাত খোলা চানাচুর কেনা মেয়েটির কথা ভোলা আমার পক্ষে শক্ত—মনের উপর সে যে অগোচরে একটি দাগ কেটে গেছে সে তো মোছেনি; সেই পড়ে যাওয়া চানাচুরকটি তার জন্য ছল্‌ছল্ ক'রে ওঠা দুটি চোখ সে কি মিছে? জানি আমি আপনারা সংসারের মানুষ হাস্‌বেন; কিন্তু সেদিনের সেই ছোট ঘটনাটি বিশ্বের বীণার তারে কি একটা বেদনার আঘাত দিয়ে গেল না? এই দক্ষিণের জান্‌লাটি খুলে চেয়ে থাকি—আমি রাস্তার ও পারের বাড়ীগুলির দিকে। দুপুরে হেঁকে

যায় ফিরিওয়ালা, চুড়ীওয়ালা ; মনে হয় যেন সে বেড়াচ্ছে বেদনা বেচে। তার চুড়িগুলি যেন বেদনার বন্ধন। দেখলুম সেদিন ওই গলিটার একটা বাড়ীর সাম্‌নে নিস্তব্ধ দুপুরে গুটি কয় নারী চুড়ি পর্‌ছে। সুন্দর হাতগুলি একে একে এগিয়ে দিচ্ছে দাড়ীওয়ালা চুড়িওয়ালার দিকে। সে টিপে টিপে আধ বোজা চোখে তাদের পরাচ্ছে চুড়ী। যারা পর্‌ছে তারা সধবা। কিন্তু এই সধবা হবার বেদনা সে কি আমি বুঝিনে? মন র'য়েছে কার কাছে হয়তো কিন্তু সমাজের খাতিরে দেহটাকে একটা লোকের শাসনেই রাখতে হবে। কিন্তু এ চুড়ী একজন পর্‌তে পার্‌ল না দেখ্‌লুম। সে বিধবা। বয়স বছর চল্লিশেক হবে ; কিন্তু চুড়ী পর্‌বার জন্য তার হাত দুখানি উঠছিল ব্যাকুল হ'য়ে, বুঝলুম, পর্‌তে পার্‌লে না তবু, আমি দেখলুম। মনটা আমার রবিবারের ডালহৌসী স্কোয়ারের মত খাঁ খাঁ কর্‌তে লাগল। তারপর চুড়ী কিনে এনে চোখ বুজে সেই চুড়ী না পরা হতভাগিনীর হাতখানি কল্পনা করে চুড়ী কয়গাছিকে পরিয়ে দিলাম আমার এই টেবিলের পায়াতে দেখুন।"

দেখিলাম টেবিলের একটি পায়াতে কয়েকগাছি রেশমী চুড়ী পরানো আছে। হরিকুমার বলিয়া যাইতে লাগিল, "এগুলো কি দুঃখ বলুন তো? এসব কি একেবারে তুচ্ছ করবার? লালবাজার থেকে সুরু করে বাগবাজার অবধি একদিন চীৎপুর দিয়ে চলে যান দেখবেন দুঃখ নানা রকমে মূর্ত্তিমান্ হয়ে রয়েছে। সেদিন যাচ্ছিলুম; একটী মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল পথে, প্রত্যাশায় কার জন্যে কে জানে? আমার সমস্ত বুকটা বেদনায় ভরে গেল। তার কাছে গিয়ে একটা কথা বল্‌তেই সে আমার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাইলে। আমি ব্যথা পেলুম বটে কিন্তু সেই

সঙ্গে বুঝতে পার্‌লুম তার নিজের ব্যথাটা কতখানি। তার এই যে ক্রোধের প্রকাশ এতো বেদনার রূপান্তর। জগতের কাছে ঘা খেয়ে খেয়ে সে ঘা আজ সে ফিরিয়ে দিলে আমার উপর। জগতের অবিচারের বোঝা বইলুম আমি নিজে। তার রং করা ঠোঁট দুখানির ফাঁক দিয়ে দুপাটী দাঁত হাসির আকারে বেরিয়ে এল; কিন্তু সে তো হাসি নয়, মনের দারুণ বেদনাই হাসির রূপ ধ'রে বাইরে এল! এসব কথাতো মুখে ব'লে শেষ করা যাবে না; চিঠিতে আপনাকে জানাতে পারি যদি বলেন।"

আমি বাঁচিয়া গেলাম,—কহিলাম "সেই ভালো, সব গুছিয়ে চিঠি লিখো।"

এমন সময় ঝি ঘরে প্রবেশ করিল। চকিতে একবার দেখিয়া লইলাম। বেশ মোটা সোটা, কালো আধবয়সী একটী স্ত্রীলোক খোঁপায় একটা গোলাপ ফুল। ঝি জিজ্ঞাসা করিল, "চা আর আস্‌বে কি ?"

হরিকুমার উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, না।

ঝি চলিয়া গেল।

হরিকুমারকে উঠিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "উঠলে যে।"

ঝি সিঁড়ি দিয়া নামিতেছিল; তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া হরিকুমার কহিল, "আমি একে শ্রদ্ধা করি! জানি আমি যে চল্‌তি ভাষায় আর কোনও পদবী নেই এর ঝি ছাড়া। কিন্তু আমি জানি এর জীবনের ইতিহাস, কত বড় মহান্ কোমল কঠোর হৃদয় এর তা জানি। বাঁকুড়ায় বাড়ী, বিয়ে হ'য়েছিল ছেলে বেলায়, পনেরো বছর স্বামীর ঘর করবার পর তার স্বামীর হ'ল পায়ে গোদ। এ

তৎক্ষণাৎ বল্‌লে, আমি আর তোমার ঘর কর্‌ব না। স্বামী তাকে পায়ে ধরে সেধেছিল, ফেরাতে পারেনি তবু। এম্‌নি বজ্রের মত কঠোর এর প্রাণ! তারপর চলে এল কলকাতায়, সমাজের স্বামীর সেই 'কুটিল কুশ্রীতা'র সঙ্গ ছেড়ে এক ফুলুরীভাজা বামুনের সঙ্গে। সমস্ত হৃদয়খানি এই দু'দিনের পরিচিত অতিথিকে নিঃশেষে দান ক'রে কল্‌কাতায় সে এল! কী করুণ আত্মত্যাগ! শ্রদ্ধা করি এই জন্যে যে এ মানেনি কারো হুকুম—সমাজের বা সংসারের—শুধু মেনেছে হৃদয়ের আদেশ! আর তার নতুন সাথীটির উপর কি তার ভালোবাসা! সন্দেশ খাবার জন্যে আট আনা দিলেও দু'পয়সার ফুলুরী ছাড়া আর কিছু সে কিনে খাবে না!" আমি উঠিয়া কহিলাম, "আর তো থাকতে পাচ্ছিনে হরি! তোমার অনেক কথা আছে সব চিঠিতে লিখো। আমি মাসীকে লিখে দেব তুমি ভালো আছ।"

হরিকুমার কিছু কহিল না, দক্ষিণের জানলা দিয়া বাহিরে চাহিয়া রহিল। আমি নীচে নামিয়া আসিলাম।

ঝি তখন কলতলায় দাঁড়াইয়া মেসের ভোজপুরী ঠাকুরটির সহিত রহস্যালাপ করিতেছিল।

“বাস্তবিকা”

হরিকুমার সংবাদ

সেদিন আবার শ্রীমান্ হরিকুমারের সংবাদ পাওয়া গেল। প্রাতে জমা-খরচের হিসাব মিলাইতেছি এমন সময় মেয়ে আসিয়া ডাকিল,—“বাবা, চিঠি আছে।” চিঠি লইলাম। সবুজ খামের মধ্যে একখানি ছোট সবুজ কার্ড, তাতে হাতের লেখা ব্লকে এই কয়টি কথা ছাপা,—“আজ সন্ধ্যায় আমাদের ‘বাস্তবিকা’র নব পল্লবোদ্গম হবে। আস্‌বেন অবিশ্যি, নৈলে দুঃখ পাবো খুবই।” কিছুই বুঝিলাম না। শুধু বোঝা গেল যে শ্রীমান্ হরিকুমারের মেসেরই কোনও ব্যাপার, কারণ ঠিকানা সেখানকারই এবং এককোণে ছোট বাঁকানো অক্ষরে লেখা ‘কুমার রায়’। বেলা ৪টার সময় ছাতি ঘাড়ে করিয়া বাহির হইয়া আধঘণ্টা পরে হরিকুমারের মেসের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। মেসের দরজার মাথায় দেবদারুর কচি পাতা দিয়া অক্ষর গাঁথা—“বাস্তবিকা”। নানা প্রকার পাতার মালা দোতালার বারান্দার রেলিং হইতে ঝুলিতেছে, ফুলের চিহ্নও নাই; মধ্যে মধ্যে সবুজ কাগজ ও কাপড়ের নিশান। দরজা দিয়া ঢুকিতেই হরিকুমারের মেসের সেই ঝি দুই হাত জোড় করিয়া মিহি গলায় কহিল,—“নমস্কার,

আসুন!" একবার চাহিয়া দেখিলাম, তাহার পরণে আলপাকার সবুজ শাড়ী, মাথায় আধঘোমটা, পাতা কাটা চুলে উঁচু কপালের আধখানা ঢাকা, হাতে মাধব-মঞ্জরীর দুইগাছি বালা। তাহার সম্বর্দ্ধনার উত্তরে অন্ততঃ একটা কথা বলাও উচিত ভাবিয়া কহিলাম, "ভাল আছতো ?"

ঝি ঘাড় বাঁকাইয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "ভালো ? ভালো তো থাক্‌তেই হবে আজ আমাদের—"

সর্ব্বনাশ! এও যে কবি হইয়া উঠিয়াছে দেখিতেছি! তাড়াতাড়ি কহিলাম,—"বেশ, বেশ, ভাল কথা! ভাল থাক, সুখে থাক বাছা! এরা সব—"

"দোতালায়। যান ধীরে ধীরে—"

কথা শেষ না হইতেই দ্রুতবেগে একেবারে উপরের সিঁড়ির মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম, একটু সংশয় হইল, এই প্রাণীটিকেই 'বাস্তবিকা' নাম দিয়া হরিকুমার ইহার পল্লবোদ্গম করাইতে আরম্ভ করে নাই তো! চুলে পাতা কাটাও দেখিতেছি! ঝি আমাকে লক্ষ্য করিতেছিল। কাজেই আর বিলম্ব না করিয়া সিঁড়িতে পা দিলাম। সমস্ত সিঁড়িটা সবুজ কাগজ দিয়া ঢাকা। রেলিংএর আগাগোড়া আম, জাম, দেবদারু এবং ব্যোটানিক্যাল গার্ডেনের সর্ব্ববিধ গাছের পাতা দিয়া মোড়া। দোতালায় হরিকুমারের ঘরের সম্মুখে দরজার মাথায় কতকগুলি বোঁটা ছাঁটা পান দিয়া প্রকাণ্ড একটী পেষ্টবোর্ডে লেখা "বাস্তবিকা", আর প্রত্যেকটি অক্ষরের মাঝে এক একটি তীরের ফলা লাল কালি দিয়া আঁকা। সবুজ পরদা তুলিয়া ঘরে ঢুকিতেই যে দৃশ্য চোখে পড়িল তাহা অপূর্ব্ব! সবুজ কাগজ দিয়া ঘরখানির সমস্ত দেয়াল ঢাকা, মেঝেও তাই। মধ্যে একটি সবুজ বনাতে মোড়া

গোল টেবিল, তাহার চারি পাশে কয়েকটি ভদ্রলোক সকলের গায়েই সবুজ সিল্কের পাঞ্জাবী, পায়ে সবুজ ভেলভেটের নাগরা। হরিকুমারকে ডাকিব ভাবিতেছি এমন সময় একজন উঠিয়া আসিল, দেখিলাম হরিকুমার স্বয়ং। বেশ অপর সকলের মতই, পার্থক্যের মধ্যে তাহার কপাল বেড়িয়া একটা পাতার মুকুট। হরিকুমার আসিয়াই আমার হাত ধরিয়া অতি করুণ স্বরে কহিল,—"কৈ তেমন ক'রে তো আসেন নি!" তেমন করিয়া আসি নাই মানে কি! অবাক্ হইয়া একটা প্রশ্ন খুঁজিতেছিলাম, সহসা হরিকুমার কহিয়া উঠিল, "কৈ সবুজের পসরা কোথায়? আজ যে সবুজের মেলা বসেছে আমাদের।"

এতক্ষণে বুঝিলাম। হংস মধ্যে বকের মত একমাত্র আমিই সাদা জামা আর ধুতি পরিয়া আসিয়াছি। কহিলাম, "তুমি তো স্পষ্ট ক'রে কিছু লেখনি।"

"স্পষ্ট! স্পষ্ট কাকে বলে? জগতে স্পষ্ট কিছু আছে? ধরণীর ধূলিতে সব আবছায়া হ'য়ে যায় না কি? সাধের বাস্তবিকার পল্লবোদ্গম হবে আজ, আশা করেছিলাম নব কিশলয়গুচ্ছ হাতে আস্‌বেন আপনি—"

চট্ করিয়া মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিল। আজিকার অবস্থা আমার পক্ষে মারাত্মক এবং পলায়নই শ্রেয়ঃ ভাবিয়া বলিলাম,—"তাহ'লে বাসা থেকে জামাকাপড় বদ্‌লে আসি, কি বল?"

হরিকুমার কহিল,—"না, তা হবে না। যেতে দেবো না আপনাকে। জানি আমি আপনি ফির্‌বেন না তাহ'লে। যে যায় সে আর ফিরে আসে না।" বলিয়া একটি ছোটরকমের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হরিকুমার কহিল "বসুন আপনি, আস্‌ছি আমি।"

একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া নিস্তব্ধ সবুজ মূর্তিগুলিকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। অল্পকাল পরেই একখানি সবুজ রংয়ের কম্বল হাতে করিয়া হরিকুমার আসিয়া উপস্থিত হইয়া কহিল,—"গায়ে দিন্ এইটে।" চমকিয়া উঠিলাম, এই দারুণ গ্রীষ্মে কম্বল! হরিকুমার আমার মুখের দিকে চাহিয়া অতি করুণ স্বরে কহিল,—"কষ্ট হবে হয়তো আপনার। তবু "বাস্তবিক"র মুখ চেয়ে আপনি এ কষ্টটুকু সইবেন, এ আশা কি একান্তই দুরাশা? এই সবুজের ছন্দোলীলার মধ্যে একা আপনি রইবেন ছন্দোহীন অতিথি!" এই বলিয়া হরিকুমার আমার গায়ে কম্বলখানি জড়াইয়া দিল; আমার কথা জোগাইল না; কম্বলে আকণ্ঠ ঢাকিয়া বিনা প্রতিবাদে ঘামিতে আরম্ভ করিলাম। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া হরিকুমার আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিয়া উঠিল,—"আজ 'বাস্তবিকা'র নব পল্লবোদ্গম, আপনাকে আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ কর্ত্তে হবে সকলের আগে। আশীর্ব্বাদ করুন তাকে, বেঁচে থাকে সে যেন।"

আমি কহিলাম, "ব্যাপারটা আমি তো কিছুই জানিনে—"

হরিকুমার বাধা দিয়া কহিল,—"একটু রহস্যময় নিশ্চয়ই মনে হবে, শুনুন তবু। (চেয়ারে উপবিষ্ট সভ্যগণকে দেখাইয়া) কালীসিংহের গলিতে এঁরা সভা করেছিলেন দু'বচ্ছর আগে। তার কাজ ছিল জগৎকে তার সত্যরূপে দেখা, নাম ছিল বস্তুতান্ত্রিক সভা। সভার নেতা জগৎকে খাঁটি চোখে দেখ্‌তে গিয়ে দেশত্যাগী হ'লেন,—তাঁর সঙ্গে গেল সত্যেরই উপাসিকা এক তরুণী, পল্লীরই এক রজকের বিধবা ঝিয়ারী। সমাজ ধিক্কার দিল, তাঁরা তাতে ভ্রূক্ষেপ কর্‌লেন না, গেলেন চলে। পাড়ার লোকের শ্যেন দৃষ্টি পড়্‌ল গিয়ে সভার উপর;

সেই খর-দৃষ্টিতে শুকিয়ে গেল সভাটি। কিন্তু যা সত্য তাকি মর্‌বার? এঁরা আমার কাছে এসে জানালেন সব কথা; তারপর এই দেখছেন, সেই বস্তু-তান্ত্রিক সভা আজ সে 'বাস্তবিকার রূপ নিয়েছে—আজ হ'বে এর নূতন জীবন, নূতন বৎসর, নব পল্লবোদ্গম। সবুজ পাতায় সর্ব্ব অঙ্গ শিউরে উঠবে তার—"

কহিলাম "চমৎকার! আমি আশীর্ব্বাদ কচ্ছি 'বাস্তবিকা' বেঁচে থাক! এর আজ পাতা হোক্, কা'ল ফুল; তারপর ফল হোক্; বাঙ্গালা দেশ সেই ফলের স্বাদ গ্রহণ করুক্!"

হরিকুমার উঠিয়া মাথা নত করিয়া কহিল,—"স্বস্তি! স্বস্তি! কিন্তু শুধু বাঙ্গালা দেশ বলবেন না, বিশ্বমানব ভোগ করুক এর ফল, তার গন্ধ বর্ণ রূপ রস আবিষ্ট করুক্ বিশ্বমানবকে, সেই আশীর্ব্বাদ করুন।"

আশীর্ব্বাদ করুন, জটিল মিথ্যার ভস্মস্তূপের উপর প্রতিষ্ঠিত যেন হয় 'বাস্তবিকার' মন্দির। সত্যকে যেন সহজে স্বীকার কর্ত্তে পারি। সমাজ ও সংস্কারের মিথ্যা যবনিকা যেন বাস্তবিকাকে আবৃত না কর্ত্তে পারে! চিন্‌তে যেন পারি শুধু সত্যকে, গ্রহণ কর্ত্তে পারি যেন সত্যকেই শুধু। সত্যের জন্যে যে আকাঙ্ক্ষা মনে জাগে তা কি শুন্‌বেন? বুকে হাত দিয়ে বলুন দেখি এ আকাঙ্ক্ষা মনে জাগে কিনা আপনার? ঐ যে মোটরে চ'ড়ে চপলা ঝলকের মত দুটি তন্বী চ'লে গেলেন—বুঝি দেখা গেল, বুঝি দেখা গেল না—তাদের জন্য বুকে কি তৃষ্ণা জাগে নি আপনার? যদি জেগে থাকে তবে তা মেটাবার প্রয়াসটাই কি মিথ্যা? নয়, নয়, কিছুতেই নয়—চিরন্তনী ক্ষুধা পুরুষের মনে—এই ক্ষুধা থেকেই তো জন্মে প্রেম, একি

অস্বীকার কর্‌বার? আমি তো একে অস্বীকার কর্ত্তে পারিনে, হৃদয় যা চায় তাই তাকে দিতে হবে—তার ক্ষুধার অনুরূপ খাদ্য চাই, থার্ড ক্লাশ ফিমেল ওয়েটিং রুম থেকে ঐ মেয়ে-কলেজের গাড়ী, সবই যে চাই তার? শিশু হাত বাড়িয়ে চাঁদ চায় সে কি মিছে? হৃদয়-খোকন যে আজ চারিদিকে হাত বাড়িয়ে পাড়ার সমস্ত বাড়ীর জানালার শিক্ ধ'রে টান্‌তে চাইছে, এ চাওয়া কি মিছে? নয়, নয়! এই চাওয়াটাই তো সত্যিকার জিনিস। এই চাওয়ার আনন্দেই তো কবিতার জন্ম, এই তৃষ্ণার আকর্ষণেই তো বিশ্ব-সাহিত্যের সৃষ্টি হ'য়েছে। আজ এই সত্যকে যাঁরা স্বীকার করেন, বিদ্রূপ তাদের মাথার উপর ঘনিয়ে আসে, আর যাঁরা মনের এই চাওয়াকে গোপন রেখে যান জগতের স্তুতি তাঁদের বাড়ীর দরজায় দিনমান গুণ-গুণিয়ে উঠতে থাকে। আমরা সত্যকে স্বীকার করব, যৌবন-অভিষানের রক্ত-কেতন হাতে অগ্রসর হব সবুজ-সাধকের দল! আপনাকে এই সঙ্গ নিতে হবে—জীবন ব্যর্থ কর্ত্তে দেব না আপনাকে।" হরিকুমার আবেগের মুখে আমার হাত চাপিয়া ধরিল।

গ্রীষ্মে এবং হরিকুমারের বক্তৃতার উষ্মায় ভয়ানক ঘামিতেছিলাম, কহিলাম, "প্রায় যে চল্লিশের কাছাকাছি এসে পড়েছি হরি, এখন আর—"

হরিকুমার বাধা দিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "চল্লিশ! আপনার মুখ থেকে এ কথা যে শুন্‌তে হবে তাতো ভাবিনি! সবুজের বয়স আছে কি? বসন্তের হাওয়ায় গড়ের মাঠের বুড়ো বটগাছটায় যে পাতা বেরোয় সে কি সবুজ নয়? অথচ তার বয়স কত সে তা নিজেই জানে না। ঝুনো বুড়ো উকিলের লেখায় সবুজ সত্য কি ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফেনিয়ে ওঠে না? সেই মহিয়সী নারী George Sandএর (এই-

খানে হরিকুমার মাথা ঈষৎ নত করিল) লোকদেহের অন্তরালে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত নিবিড় সবুজের আনন্দঘন রস কি উছ্‌লে উঠেনি? হৃদয়ের বয়স কি আছে? তা নেই ব'লেই তো সব মধুর লাগে আমাদের। তা নেই ব'লেই তো আমাদের পাঁচী পানওয়ালীর শীর্ণ দেহকেও ঘৃণা কর্ত্তে পারিনে; তাকে দেখেই মন ফিরে যায় ত্রিশ বছর আগে তার জীবনের সবুজ দিনগুলির মধ্যে—যে দিন তার ওই দেহখানি হাজার মানুষকে আনন্দ দিয়েছিল সেই দিনের কথা মনে পড়ে। ফোটা আর আধ-ফোটা নিয়ে যে বেসাতি আমাদের, এই সবুজের সাধন-মঞ্চে সবাই আমাদের দেবতা; মায়ের কোল থেকে সদ্য উঠে যে নবমুকুলটি বোধোদয় হাতে পেয়ারা চিবুতে চিবুতে ঝির হাত ধ'রে পাঠশালায় যায় তার ডুরে শাড়ীটির দোদুল আঁচল আমাদের বুকে কাঁপন জাগায়—সেই সঙ্গে তারি হাতধরা ঝি-টির কুঁচকে ওঠা দেহখানার দোলুনি আগুন লাগায় আমাদের মনে। বিদ্রূপের দমকলে এ আগুন তো নেভাতে পারবে না কেউ! এই যে মনের ক্ষুধা একি অস্বীকার করবার? এই সবুজ সত্যের প্রচার কর্ব্বে 'বাস্তবিকা'। আজ মনে আমাদের সবুজের ফোয়ারা ছুটেছে, আনন্দের বিপ্লব জেগেছে —সুরে বেসুরে সবুজের গান বেজেছে, আজ আর কথা নয়। সম্ভাষণ নিন্ বাস্তবিকার।" হরিকুমার আসন লইল।

আমি কম্বলের আবরণ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলাম,—"তোমার সবুজের সাধনা সার্থক হোক্ হরি, মেঘ ক'রে এসেছে, ছাতিটা ভাঙ্গা, বেরোই—" বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। হরিকুমার আবিষ্টের মত বসিয়া রহিল।

তখন বৃষ্টি নামিয়াছে, ছাতি মাথায় দিয়া পথে নামিতেই শুনিলাম "বাস্তবিকার" সভাকক্ষে কোরাস্ উঠিয়াছে ;—

"জোছনা রাতে, জোছনা রাতে,
বাদল বাতে, বাদল বাতে,
মটর মসুর মিশায়ে গিয়াছে
প্রাণের ক্ষেতে।
জোছনা রাতে, জোছনা রাতে।"

রিক্তপ্রবাস

[রাখন মাসীর ক্রমাগত তাগিদে অনেক বলিয়া কহিয়া হরিকুমারকে দেশে পাঠাইয়াছিলাম। দুই দিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া সে আমাকে যে পত্র দিয়াছে সেখানি আদ্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।—শ্রীদিবাকর]]

দেশে গেলুম ফিরেও এলুম। এই যাওয়া আর আসার মর্ম্মের ইতিহাসটুকু না জানাই যদি আপনাকে তবে নিজেকে প্রতারণা কর্ব্ব। তাই সব কথা লিখে ভেবেছিলুম ধরণীতে ব্যর্থ কি কিছুই নেই, কিন্তু মায়ের ঘরে এই দুদিনের প্রবাস আমার ব্যর্থ কি গেল না?

যেতুম না আপনার কথাতেও, কিন্তু আমার বান্ধবী মিস্ নূপুর নাগের অনুরোধ অগ্রাহ্য তো কর্ত্তে পার্ল্লুম না। শুনলুম তাঁরা দেখ্‌তে চান আমার লেখার তুলিতে আঁকা পল্লীর কৃষক-বধূর অনাড়ম্বর বাইরের আড়ালে লুকানো ধূমায়িত অগ্নিগিরির মত হৃদয়ের ছবিটি। ছুট্‌লুম্। ষ্টেশনের টিকিট ঘর, তার পর ট্রেণ তার পর রাত্রিশেষে মাঠের মাঝখানে টীনের চালাঘর—নাম্‌লুম্। সেখান থেকে ছোট একটি তরণীতে হেলেদুলে মাঝ গাঁয়ের ঘাটে।

কিন্তু একি গ্রাম! যেন পুতুলের দোকান একখানি। কোথায় সে চিম্‌নীর ধোঁয়া, কোথায় সে জীবন-ঢেউয়ের তালে-তালে দোলন দোলা বস্তি, কোথায় সে জানালার ফাঁকে ফাঁকে তৃষায় ভরা আঁখি-তারার চাউনী! কিছু নেই! কিছু নেই! কলের পুতুলের মত চল্‌ছে সব। হায় হায়! এত সবুজের মাঝখানে একি পাক-খাওয়া হল্‌দে প্রাণগুলো! পথে চল্‌ছি। কার্ত্তিকের কুহেলিকা ভোর রাত্তিরের বৌয়ের মত তখনও জড়াজড়ি কর্চ্ছে আশশ্যাওড়ার ডালের সাথে অচলচলা গাঁয়ের পথে। একটু থম্‌কে দাঁড়ালুম—দূরে কেও! আস্‌ল এক তরুণী তার ভরা-দেহের কাঁখে জল-ভরা ঘট বাঁ হাতে সাপ্‌টে ধ'রে—যেন সে প্রণয়ী কুহেলির ধোঁয়ালিমা ভেদ ক'রে। স্নানে ভেজা বৃন্দাবনী শাড়ীখানা মিলিয়ে যেতে চাইছে তার অঙ্গের সাথে ধূপের ধোঁয়ার মত। ব্যাগটি মাটিতে নামিয়ে ব'লে উঠ্‌লুম, "ওগো সেই তুমি! আমার মনের কল্পলোকের পথ-বিচারিণী তুমি রাণী!" জানিনে সে আমার পানে চাইল কি না, শুন্‌লে কি না আমার বাণী তাও জানিনে। দেখলুম শুধু চকিতে তার কাঁধের গামছা খুলে জড়িয়ে শিশির ধোয়া যুঁইয়ের মত সারা অঙ্গটি তার আমার চোখের আড়াল ক'রে দিলে। হায়রে সংস্কারের সঙ্কোচ! ব্যথায় ভ'রে গেল প্রাণ, ধীরে ধীরে ব্যাগটি তুলে ঘরে গেলুম। মা বেরিয়ে এলেন, জিজ্ঞেস কর্‌লেন, "শরীর ভাল আছে তো হরি?" স্তম্ভিত হলুম। শরীর, শুধু শরীর! শুধু এই তুচ্ছ দেহখানার কথাই সবাই শুধোয়! মনের খবর তো জান্‌তে তিনি চাইলেন না। কিন্তু মন আমার নীরব রৈল না তো, কত কথাই কইতে লাগ্‌লো সে। যেন এসেছে সে ক্ষুধিত পথিক, নিমন্ত্রণের অপেক্ষা তো রাখ্‌বে না সে! সমস্ত দিন ক্ষুধায় উদাস হ'য়ে রৈল মন।

সন্ধ্যায় পথে বেরিয়ে তৃষিত দৃষ্টিতে চাইতে লাগলুম চারিদিকে, সবই যেন প্রাণহীন পুতুল। মেয়েরা ঘাটে চলেছে জল আন্‌তে, একটু টেরছা চোখে চেয়ে গেল বটে, কিন্তু সে দৃষ্টি যেন মড়া মানুষের, তাতে নেই জ্বালা, নেই দাহ। চাষা চলেছে বলদ দুটির কাঁধে হাত রেখে, এঞ্জোলার ডেভিডের মত তার জমাট দেহ কিন্তু প্রাণ যেন নেই তাতে, চল্‌ছে সে সোজা ; গত নিশির জীবন-রসের ঘোরে ট'লে ট'লে পড়্‌ছে না তো! চলেছে রাখাল ছুটি, মুখে তাদের হাসি আছে, বাঁশী নেই, কোকেন খেয়ে চোখ দুটো ঠিক্‌রিয়েও তো পড়্‌ছে না! গ্রামের ঠান্‌দি ষাট বছরের দত্ত বুড়ী আস্‌ছেন আধমণী একটা ঘড়াতে শিবের মাটি নিয়ে অনায়াসে, কৈ তাঁর যৌবনের সবুজ দিন-গুলো চোখের কোণের কালো রেখায়, সারা গায়ের ঘায়ের দাগে তাদের কোনো নিশানা রেখে যায়নি তো!

নিষ্প্রাণ, নিষ্প্রাণ সব! মড়া গুলো দেখে দেখে বিষিয়ে উঠ্‌ল মন, সেই বিষের ব্যথায় কেঁদে কেঁদে মন বল্‌লে আমার অন্তরের কাণে কাণে, "এই মরণখনি খুঁড়ে খুঁড়ে পেতে হবে প্রাণের পরশমণি!" পেতে হবে! পেতে হবে!! বের হলুম ঘর ছেড়ে, কিন্তু কোথায় সে? মনের ক্ষুধায় দেহের দাহে আজ বৎসহারা সাহারার মত তিয়াসী আছে কে? কোথায় আছে আমার মানস-স্বপ্নলোকের ইন্দ্রাণী! নদীর ধারে জেলে পাড়ায় আঁধার গলির মাঝে গিয়ে চাইলুম্ হল্‌দে পোকায় খাওয়া বাঁশের বেড়ার পাঁজরের ফাঁক দিয়ে দামুজেলের বাড়ীর আঙ্গিনায়—ওই বুঝি সে? শিউলি বোঁটার প্রাণের রঙে ছোপ দেওয়া শাড়ীখানায় অঙ্গ ঢেকে মাটির প্রদীপ হাতে জেলে-বৌ। আমার সকল কামনাকে সার্থক ক'রে নিবিড় সন্ধ্যার অন্ধকারে বুঝি যায় সে, তার সাঁজের হাটে কাঁকড়া বেচা স্বামীর

চোখ এড়িয়ে এঁদো ডোবার তীরে তীরে চরণ ফেলে গহন মায়া বাঁশের বনে কোন গোপন পথিকের অন্বেষণে! এতদিনে পেলুম কি? মন ব'লে উঠ্‌লো, "পেলে বুঝি! পেলে বুঝি!" কিন্তু এলো না তো সে আগুন পার হ'য়ে রাখলে সে মাটির প্রদীপ তুলসীতলায়, সেইখানে নুয়ে পড়্‌লো তার মাথা। কি নিদারুণ পরিহাস!

বলুন তো কি বিদ্রূপ কর্‌লে এই নারী তার অন্তর-দেবতাকে! কিন্তু কি তার দোষ? বাইরের সংস্কারের কাছে মানুষকে কি মূল্যে বিকিয়েছেন আপনারা? তাজা সবুজ মনের গাছের মাথায় এই যে কুড়ুল মারছেন আপনারা চিরটা কাল, তাতে কি চির-সুন্দরের অসম্মান করছেন না? কিন্তু আপনার সঙ্গে তর্ক বৃথা, আপনাকে আমি জানি। সেদিন আপনি গাড়ী কিনেছেন তার রং হল্‌দে, সেই হলুদ গাড়ীতে হলুদ রংয়ের শাড়ী পরিয়ে সেদিন বৌদিকে নিয়ে যখনি আপনাকে লালবাজারের দিকে যেতে দেখ্‌লুম্, সেইদিনই আপনার সম্বন্ধে নিরাশ হয়েছি আমরা, তখুনি বুঝেছি সবুজের কল্যাণ-আশ্রয় ত্যাগ করেছেন আপনি স্বেচ্ছায়।

মনের দুঃখে রূঢ় বল্‌লুম, রাগ কর্ব্বেন না যেন। দুঃখ যে কতখানি তা কি বিনিয়ে বিনিয়ে বল্‌তে হবে আর? দামু জেলের কানাচ ছেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে চ'লে এলুম। ছাতের চিলে কোঠায় ব'সে ব্যাকুল চোখে চেয়ে রইলুম পাল-বাড়ীর দোতালায় জান্‌লার ফাঁক দিয়ে। বাতি জ্বলছে। তার সাম্‌নে বসে ভাতের থালায় পাখা করছে এক নারী, কাজল-আঁকা আকুল চোখ তার বার বার সিঁড়ির দিকে চেয়ে চেয়ে ফিরে আস্‌ছে। এই নিশীথ রাতে গোপন পায়ে চোরা পথে কেউ কি আজ তার সফল সেবাকে সার্থক কর্ত্তে আসবে না? মনের সাড়া পেলুম, বল্‌লে সে

"সারাদিনের সন্ধানের ধন নিশীথরাতে পাবে বন্ধু, পাবে!" তাই হোক্! তাই হোক্! সার্থক হোক সকল অন্বেষণ আজ, এই গহন রাতে ঐ ঘর খানির মাঝে! কিন্তু তাতো হ'ল না। নারী সহসা হেসে উঠ্‌লো, চম্‌কে চেয়ে দেখ্‌লুম, এল তার স্বামী—নাম-পাওয়া গলায় কাঠের মালা কলসী-গড়া গদাই পাল নিত্যকারই মত। আর নারী হেসে তারই পায়ের ধূলো আঁচল দিয়ে—

ছিঃ ছিঃ! কি বিদ্রূপ বলুন দেখি? কাঁদনের বাঁধ খুলে দিয়ে বলে উঠ্‌ল মন, "রিক্ত-প্রবাস, বন্ধু রিক্ত-প্রবাস! ফিরে চল! ফিরে চল!"

সারা রাত জেগে চেয়ে রইলুম এই মড়া গাঁয়ের পানে সজল চোখে অনিমেষে! রাতশেষে আবার সেই মাঝগাঁয়ের ঘাট, সেই পাখী, সেই ভেসে যাওয়া হেলে দুলে। রিক্তপ্রবাস, ব্যর্থ প্রবাসের শূন্যতার জ্বালা বুকে ব'য়ে ভেসে চল্‌লুম। কিন্তু আগুন সব পুড়িয়েও সোণার ঝলক্ দেখিয়ে যায়, এই রিক্তপ্রবাসও একটুখানি পুলকের রেশ জাগিয়ে গেছে মনের বীণার তারে। সে ক্ষীণ আনন্দের কথাটুকুও এই চিঠিটার শেষ পাতায় ব'লে যাই। ঘাট ছেড়ে বাঁকের মুখে দেখলুম ছাউনী ভাঙ্গা পান্সী একখানি। তার উপরে লুটোচ্ছে দুজোড়া তবলা, ছেঁড়া ঘুঙুরের সাথে। তার একটাকে বালিশ ক'রে মাথা এলিয়ে দিয়েছে এক যুবা আর তারই পাশে এক নারী—রোজসিরাপের খুন রাঙা সরবতের মত ঢলঢলে তার দুটি চোখ, খিল্‌খিলিয়ে হাস্‌ছে সে। আর তারই পায়ের কাছে ঢেউয়ের তালে তালে অধীর পুলকে গড়াগড়ি দিচ্ছে কাঁধ-ভাঙা একটা সবুজ বোতল, উজার ক'রে দিয়ে তার সুধার সঞ্চয় ঐ নারীর পিয়াসী অধরে। চকিতে দেখে নিলুম আনন্দ-মুক্তির এই ছবিখানি। পান্সী

বাঁকের বুকে মিলিয়ে গেল। এইটুকু দেখেছিলুম বলেই তো রিক্তপ্রবাসের বেদনা-কাহিনী লিখতে পারলুম্, নৈলে কি যে হ'ত তা তো ভাবতেও পার্চ্ছিনে।

আমার পৌঁছা খবর মাকে দিতে পারেন ইচ্ছে হ'লে।

আপনাদের কুমার।"

১৩৩৮

মরীচিকা

হরিকুমারের চিঠি

"কেন লিখছি এ চিঠিটা তাই আগে জানাই। আমি কথা কইতে কইতে উন্মনা হ'য়ে পড়েছিলুম, চোখ খুলে দেখি চলে গেছেন। অনেক দিনের কথা, কিন্তু সে কথা তো ভুলিনি। হঠাৎ এসে হঠাৎ চলে গেলেন, বল্‌বার যা ছিল বলা হোল না কিছুই—মনে যেন কোথায় একটা ফাঁক রয়ে গেল। সেই ফাঁকটা ভরাবার জন্যে আজ তিন মাস থেকে চিঠির কাগজটা টেনে নিয়ে বসেছি—একছত্র আরম্ভ ক'রে কাগজটা ছিঁড়ে ফেলেছি; কেবলই মনে হ'য়েছে কেন এ ব্যর্থ চিঠি লেখা! হৃদয়ের শূন্যতা ভরাতে কেন এ বাহিরের আয়োজন! মানুষের গড়া দোয়াত, কালি-কলম, কাগজ, ডাকঘর, পোষ্টেজ আর পিওন মনের ফাঁক ভরাতে এদের কেন ডাকব! মনের কথা সঞ্চারিত করে দিতে পারিনে কি, এই নীল মেঘে সেকালের যক্ষের মত, এই দক্ষিণ হাওয়ায়,—এই বৃষ্টিধারায়? হয়তো আজও তা সম্ভব, তাই ভেবেই চিঠি আর লিখলুম না—শাওনের মেঘকে জানিয়ে দিলুম আমার মনের কথাটা। ভাবলুম, মনের লিপি

ওই মেঘের পটে বজ্রের লিখনে আপনি পড়বেন ; কিন্তু ব্যর্থ সে আশা। আমার বন্ধু শিথিল সেনের মুখে যখনি শুনলুম সেই তিরিশে তারিখে সেই দারুণ ঝঞ্ঝনা বর্ষণের দিনে আপনি ছাতি মাথায় দিয়ে বৌ-বাজারের মোড়ে আপিসের মোট ক্যাশবই বগলে দাঁড়িয়ে আছেন—দেখে এসেছে সে—তখনি বুঝলুম, সব আশা ব্যর্থ। বুঝলুম যে মেঘের মুখে মনের বাণী শোনবার ভরসা আপনার নেই—বুঝলুম যে মনের চেয়ে মাথাটিকে বড় করে ভাব্‌তে শিখেছেন আপনি—মাথা, তুচ্ছ মাথাটাকে শ্রাবণ মেঘের ধারার পরশ থেকে বাঁচাবার জন্যে আশ্রয় নিয়েছেন ছাতির! অভিমান হোল—চিঠি তাই আর লিখলুম না।

কিন্তু কেন লিখছি আজ তবে? জিজ্ঞাসা করবেন হয় তো! কেন লিখছি নিজে তা জানিনে—তবে বাইরের একটা পার্থিব কারণ আছে, যদিও সেটা বড় কিছু নয় আমার কাছে, তবু তার দাম আপনাদের কাছে কিছু থাকতে পারে তাই জানাই—চলিত কথায় আমি পাশ করেছি। তবে হ্যাঁ আনন্দ পেয়েছি বটে আমিও, পাশ করে নয় ; এই পাশের সাথে সাথে আর একজনের অদৃশ্য বাহুপাশ আমাকে বেঁধে ফেলেছে—সেই বাঁধনের আনন্দ-নিবিড় স্পর্শে মন মুহুর্মুহু সজীব হ'য়ে উঠতে চাইছে। কে সে জান্‌তে চাইবেন হয় তো, বল্‌ছি গোড়া থেকে।

বাদ্‌লার এই দিনটায় তার কথা বড্ড বেশীই মনে পড়ছে আমার—এই ঘন মেঘে এই অনলস বর্ষণ এমনিতর আর একটি দিনে সে নিয়ে গিয়েছিল, আমার ছাতি। নিয়ে গেল আর ফিরে দিল না। ছাতি ফিরে দিল না বটে ; কিন্তু সেই না দিয়ে নেওয়ার আনন্দস্মৃতিতে ভরে দিয়ে গেল, আমার বর্ষার দিনগুলি।

বাস্তবিকা

কে সে তা কি জানি? কি তার পরিচয়, তাও তো জানি নে। আজ সে এসেছে আমার কাছে—আমার পাশে থাক্‌বে সে চিরটাকাল। সেদিনের সেই বর্ষণ-ঘনরাত—মিস্ চিড়িয়া চক্রবর্ত্তীর নতুন নাটিকা পড়া হোল 'চিকুর কুঞ্জে'—আমাদের মত সেও ছিল সেখানে অতিথি। নাটিকার শেষ অঙ্কের যবনিকা পড়ে গেল—বাইরে এলুম। বাদল রাতের আঁধারের কোলে দূরে গড়ের মাঠের বাতিগুলো ঝিমুচ্ছিল, 'চিকুর-কুঞ্জে' কাশ্মীরি বারান্দায় চীনে লণ্ঠনগুলোও বাদল হাওয়ায় ঝোঝুল্ ঝুল্‌ছিল।—আমি সেইখানে ছিলুম দাঁড়িয়ে, প্রতীক্ষা কর্‌ছিলুম কোন ট্যাক্সির খেয়া এসে বৌবাজারে নিয়ে যাবে আমাকে। এমন সময় পিছনে এসে কে দাঁড়াল। পিছনে চাইলুম—সে। দাঁড়িয়ে সে, মাদ্রাজী শাড়ীর নীল আঁচলটি বুকের উপর তার মুক্তা বসানো কুক্‌রী ব্রোচটির আঘাতে মরে পড়ে আছে। কিডলেদারের পাম্প-সু পা দুখানি সাপটে ধরে পড়ে আছে। চাইলুম—দেখলুম তৃষিত ব্যাকুল চোখে সে চেয়ে আছে আমার ছাতিটার দিকে। বল্‌লে অতি সভয়ে, "দেবেন ছাতিটা!" কথা বল্‌তে পারলুম না, তার চাওয়ার ব্যাকুলতায় আমার সমস্ত কণ্ঠধ্বনি আচ্ছন্ন হ'য়ে এগিয়ে দিলুম—সে নেবে গেল ছাতি খুলে। 'চিকুর-কুঞ্জের' সিঁড়িগুলো খট্‌খটিয়ে জানাল তাকে বিদায় সম্ভাষণ, এলগিন রোডের স্নিগ্ধ সরস ফুটপাত ছপ্‌ছপিয়ে কি ব'লে উঠল কে জানে? চেয়ে রইলুম—ধীরে ধীরে চলে গেল সে, এল্‌গিন রোডের পাতা বুক খানার উপর জুতোর হিলের চুম্বনে অযুত পুলকগহ্বর সৃষ্টি ক'রে ওপারের সরু গলিটার মাঝে। কোন্ গৃহে শুভ্র শুচি প্রসারিত শয্যাখানি বুক পেতে আছে তার জন্যে জানি না তো। নাম তার শুনেছি শেষে মরীচিকা রায়।

মরীচিকা! মরীচিকা! তৃষিত আঁখির সম্মুখ থেকে সরে গেল সে মরীচিকারই মত। দেরী কর্‌লুম না আর। সম্মুখে সেই মরীচিকার ছবি এঁকে চৌরঙ্গীর সাহারা দিয়ে চলে এলুম আবিষ্টের মত। বৃষ্টিধারার অজস্র চুম্বনে শিউরে উঠতে থাক্‌লুম—ছাতিটার কথা মনে পড়ল—সার্থক তার জন্ম! আজ সে কোন নিভৃত গৃহের কোণে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে এক অপূর্ব্ব দেহশ্রীর অনাবৃত সুধা সহস্র আঁখি দিয়ে পান কর্‌ছে—লোহার শিকগুলোও তার আনন্দ-বেদনায় সরস হ'য়ে উঠছে হয় তো।

পরদিন জ্বর বুকের ব্যথা—কিন্তু সে কতটুকু? মনের আনন্দের সঙ্গে দেহের ক্লেশ ছন্দ রেখে চল্‌তে পারল না তো, সেরে উঠলুম। মরীচিকা, মরীচিকার মতই রয়ে গেল; কিন্তু অমর প্রেম আজ শতবাহু বিস্তার ক'রে এই মরুর মরীচিকাকেও বুকে টেনে এনেছে আমার—নিগূঢ় বন্ধনে তাকে আমার সঙ্গে ফেলেছে বেঁধে—শাশ্বত অক্ষয় অক্ষরের বন্ধনে। আজ গেজেটে বেরিয়েছে—আমারই সঙ্গে পাশ করেছে মরীচিকা রায়—এক ব্র্যাকেটে। আজকার গেজেটখানি যেন একখানা নিমন্ত্রণ লিপি—যেন পিপাসী পথভোলা বিশ্বের কাছে একটি অমরপ্রেম, আর তার অপূর্ব্ব সার্থকতার আনন্দবার্ত্তা ব'য়ে নিয়ে চলেছে।

এক ব্র্যাকেটে! এই ব্র্যাকেটটিকে যদি আমাদের গাঁটছড়া বলে মনে করি, তবে কি একান্তই ভুল কর্ব্ব? নয় নয় নয়! কিন্তু কে জান্‌ত এমন যে হবে? এগজামিনার হয়তো জান্‌তেন না যে, তাঁর দেওয়া নম্বরগুলো প্রণয় লোকের ছোট ছোট দূতের মত এক শুভ-মিলন উৎসবের প্রারম্ভ রচনা করে চলেছে! কম্পোজিটার কি জান্‌ত

যে, তার সীসের আঁখরগুলো সাজিয়ে সাজিয়ে রচনা করে চলেছে, দুইটি বুভুক্ষুপ্রাণের বাসর-শয়ন !

জান্‌ত না, জান্‌ত না ! কেউ তা জানে না। অকারণ অকারণের মতই চলে কিন্তু গড়ে যায় শাশ্বত সুন্দর কল্পলোক। সূর্য্য ওঠে অকারণে—কিন্তু তার ওঠার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ শত কমল যে গুণ্ঠন খোলে সে কি তা জানে ? সন্ধ্যায় রেড রোড দিয়ে রূপের পশরা ব'য়ে গাড়ীগুলো ছুটে যায় অকারণে ; কিন্তু তারা কি জানে, তাদের অকারণ গতি আনন্দ-ধূলিজালে কত ধূধূ হৃদয়ে স্বপ্নসুখের কুহেলি সৃষ্টি ক'রে চলেছে ? বিশ্ব-বিদ্যালয় আজ তেমনি তার সমস্ত অকারণ দিয়ে যে রস-নিবিড় পুলক-স্বর্গ রচনা ক'রে গেছে আমার প্রাণে, তারই পরিচয় দেবার জন্যে এই চিঠি লেখা।

পাশের খবর মাকে দিতে পারেন ইচ্ছা হলে, সেই সঙ্গে জানাবেন, পাশের সঙ্গে সঙ্গে যে পুরস্কার পেয়েছি তার মূল্য নেই। আরও জানবেন গত দু'বচ্ছর ফেল করেছি—সে বহু ভাগ্যের ফলে, ফেল না করলে কি তাকে পেতাম আজ ?

আপনার কুমার।

ঝড়ের রাতে

[একখানি পত্রিকা পাইলাম। "বাস্তবিকা" হইতে উক্ত নামে শ্রীমান্ হরিকুমার ও কুমারী পলাতকা পালিতের যুগল সম্পাদনে বাহির হইয়াছে। মলাটে লেখা "ঋতু-পত্রিকা"; এখানি হেমন্ত সংখ্যা। সুদীর্ঘ মুখবন্ধ পড়িবার অবকাশ পাই নাই। প্রথমেই একটি গল্প পড়িলাম। আদ্যন্ত নকল করিয়া পাঠাই। কেমন লাগে লিখিবেন।

—শ্রীদিবাকর]

"ঝড়ের রাতে"

মেলট্রেণ থামে, থামেও না; চলে হুস্ হুস্।

মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে চলে সে, ডোবার জলে মাছ ধরে কালো ডাগর মেয়েরা—তাদের দেখে দাঁড়ায় না। মাঠের মাঝে তেঁতুল-লক্ষ্মী, বাবলা-বৌয়ের দল সারি সারি দাঁড়িয়ে দেয় হাত ছানি। চেয়ে দেখে না তাদের পানে, মেলট্রেণ চলে হুস্ হুস্।

ইণ্টার ক্লাশের ছোট কামরা! পলক একা বসে তাকিয়ে থাকে, শূন্য দুখানা গদী-আঁটা বেঞ্চের দিকে। যারা ছিল তাদের কথা মনে

জাগে—একরাশ তরুণী নেমে গেলেন সেই জংসনে—যেন তাদের অঙ্গতাপে আসন দুটি ভরা আছে। মাঝে মাঝে বসে গিয়ে তার উপরে, আর মেজেতে দোক্তার রসে লাল্‌চে কালো পানের পিকের উপর মুখ নামিয়ে থুথু ফেলে দুঃখী পলক!

জন্ম-দুঃখী। কত ব্যথাই না পেয়েছে! পড়্‌ত কলেজে; পাশের বাড়ীর মেয়ের জন্যে বুকের আগুনে প্রেমের হোম করত। পা পিছ্‌লে পড়ে গিয়ে চিলে কোঠা থেকে আঘাত পেল। কলেজের ওয়ার্ডে রাখ্‌লে নিয়ে ছেলেরা, ওষুধ খাবার ফাঁকে বিবি নার্সের মুখে চুমু দিত। এমনি করে একটি মাস। একদিন ডাক্তার দেখে তাকে দিলে ছুটি। মেসে জায়গা নেই, পরের বাড়ী ঢোকার অপরাধে বুড়ো প্রিন্সিপ্যাল কলেজের খাতা থেকে গম্ভীর মুখে দিলেন নাম কেটে যেন তিনি নীতি-রাজ্যের বাদ্‌শা পোপ্‌।

পলক দেশে ফিরে এল। আজ সে নতুন পলক, পান করেছে নতুন সুধা, সেই সুধায় মাতাল হয়ে এল সে। এই নতুন মানুষটিকে কেউ চিন্‌লে না, চিন্‌লে শুধু ও পাড়ার শুভঙ্করী। পলক তাকে আদর করে ডাকে শুভা—বিশ বছরের ঝুম্‌কো লতা—ফুল ফোটেনি। ঘরে বুড়ো মামা কানা, কেঁদে বলে বিয়ে দিয়েছিলুম বারোবছরেই, বছর পরে তারা তাড়িয়ে দিলে। কেন? মামা জবাব দেয় না, কাঁদে। শুভা গালে হাত দেয়, ভাবে সাত বছর আগেকার কথা। তার অবুঝ কালের মন্তর পড়া স্বামীর ভাগ্নে দিগম্বরের মুখ মনে পড়ে—চোখ দুটি তার ছল্‌ছলিয়ে ওঠে। প্রথম প্রথম মামীকে এড়িয়ে চলে সে, দু'মাস যেতে আর পারে না। দিনের ভাগ্নে রাতের মামা হয়,

যেন রূপকথার রাজপুত্তুর—দিনে দত্যি রাতে দেবতা। সেই তার প্রাণলক্ষ্মীর গলার দোলা প্রথম মালা, বিজয় মালা। শুভার মুখ হাসিতে ওঠে ভরে। কড়া চাপিয়ে উনুনে খিল্‌খিলিয়ে হাসে, তার স্বামীর কথা মনে করে—সে আর বিয়ে করে নি। তেল তেতে ওঠে কল্‌কলিয়ে, নিম্‌কি ভাজে।

পলক আসে রান্না ঘরে। বাঁ হাতে চিবুক ধরে ডান হাতে খাওয়ায় নিজেও খায়। মামাকে বলে ছেঁচ্‌কি রাঁধি। কানা মামা চোখে দেখে না, খেয়ে বলে বেশ হয়েছে। এমনি করে একটি বছর। ঝুম্‌কো লতায় ফুল ফোটে [illegible] এমন সময় জন্মাল এক প্রেমকাঁটা—একটি শিশু। পড়সী শুধোয়, কি ও? পলক বলে, বেড়াল কাঁদে। সবাই হাসে! হাসির জ্বালায় জ্বলে উঠে দুঃখী পলক বেরিয়ে পড়ে। বন বাদাড়ের আঁধার পথে কাঁটা ফোটে, তবু চলে দূর ষ্টেশনের আলোর পানে—জংসনে। সেখানে নামে এক ঝাড় শ্যাম্‌লী লতা। পলকের বুক ফেটে যায়—আর দুটো ষ্টেশন পরে হ'ত! তবু ওঠে সেই গাড়ীতেই চোখ বুজে। বেঞ্চের উপর গাল রেখে তাতিয়ে নিয়ে উঠে বসে, আর কেউ নেই, একা। মেলট্রেন চলে, হুস্‌ হুস্‌।

বড় ষ্টেশন। মেল থামে। "গরম দুধ" হেঁকে যায় ঘাগরা ঘেরা আহিরিণী ভরা গাঙ্গে গা ডুবিয়ে ডাহুকী যেন আসে। বয়স কত ঠাওর হয় না। পলক ডাকে, দুঃখী পলক! দুটো হেসে কথা কয়। দুধ খায় না, তবু কেনে?

নাম কি তোমার?

রাম-পিয়ারী।

ফিরবার পথে পিয়ারী বলে ডাক্‌ব তোমায়, আস্‌বে? দুখী পলক ব্যাকুল চোখে তার মুখের পানে চেয়ে শুধোয়।

শুক্‌নো ঠোঁটে হাসি ফোটে—পিয়ারী বলে, আস্‌ব। একটু গিয়ে মুখ ফেরায়, তেরছা চোখে হেনে চায় একটি শাশ্বত খোঁচা—বুকে হাত চেপে দুঃখী পলক ব'সে পড়ে।

গার্ড বাঁশী দেয়। গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে। দরজা খুলে ঢুকে পড়ে এক তরুণী—যেন একটি স্বর্ণলতা সবুজ শাড়ীর পাতায় ঢাকা। দাম চুকিয়ে কুলীরা যায়। গাড়ী ছাড়ে।

পলকের চোখে পলক পড়ে না। মেয়েটি ঘুরে দাঁড়ায়—চোখ দুটো বড় করে শুধোয়—আপনি এ গাড়ীতে!

পলকের বুক কাঁপে, কথা কয় না। মেয়েটি নিজেই বলে, মেয়েগাড়ী যে!

মেয়ে গাড়ী! মুখ বাড়িয়ে পলক বলে—নামি তবে?

মেয়েটি হাসে, বলে—নামবেন কি? গাড়ী যে চলছে!

তবে?

থাকুন না এই গাড়ীতে। যাবেন কোথায়?

লক্ষ্ণৌ।

বেশ হ'য়েছে! আমিও যাব। দু'জনে এক সাথে! কান্নায় পলকের গলা শুকোয়, ফুঁপিয়ে ওঠে দুঃখী পলক।

মেয়েটি বুঝ্‌তে পারে, কাছে এসে বলে, আপনাকে থাক্‌তে হবে এখানেই। কেউ এলে বল্‌ব—ঝি, শাড়ী আছে, পরিয়ে দেব!

পলক আকাশের চাঁদ হাতে পায়, হেসে উঠে,—বেশ হবে সে। রোমান্স হবে।

আমি খেয়া,—মেয়েটি বলে। লক্ষ্ণৌ বেড়াতে যাচ্ছি। একাই।

কে আছেন ?

সবাই। থাক্ সে কথা—বলে ঘুরে দাঁড়ায়। ইচ্ছা ক'রেই যেন সবুজ শাড়ীর আঁচলটা পলকের গায়ে বুলিয়ে দেয়। পলক কাঁপে, দুঃখী পলক।

সন্ধ্যা নামে। গাড়ীতে বিজলী বাতি। সাম্‌নের বেঞ্চে কাৎ হ'য়ে খেয়া ষ্ট্রাণ্ডবার্গ খুলে বসে। পলক গতিয়ের পাতায় হাত বুলোয়। দুজনের কথা নেই।

গাড়ী ঢালু পথে নাম্‌ছে—ঝাঁকানি। তারি সঙ্গে তাল রেখে খেয়ার দেহের ভরা গাঙে বুকের সোণার গাগ্‌রী দুটী দুল্‌ছে। দুখী পলক আড় চোখে চায় আর দোলন গোণে। হঠাৎ খেয়া ব'লে ওঠে—রাত হ'ল যে খাবে না ?

যেন কত কালের পরিচয় ! পলক শিউরে ওঠে, বলে—খিদে তেষ্টা ভুলেই গেছি। খেয়ে ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে বলে—শুধু পেটের ক্ষিদে ভুল্‌লেই কি হয় ?

তারপর ষ্টোভ ধরিয়ে গুন্‌গুনিয়ে তানা ধরে, একটা স্কচ্ গজল।

ষ্টোভের আলোয় শাড়ীর ফাঁকে খেয়ার নিটোল দেহ দেখা যায়—পলক নিঃশাস ফেলে—দুঃখী পলক !

খেতে বসে। বলে, এত এল কোত্থেকে ?

এত কি ?

ছোলা, মটর, পাঁপর-ভাজা, লুচি, পুরী ?

সঙ্গে ছিল। এস খাই দু'জনে—খেয়া বলে।

এক থালায় দু'জনে মুখোমুখী খায় আর হাসে—খাওয়া নয়তো যেন খেলা, হাত কাড়াকাড়ি।

মাঝে মাঝে পলক আড়চোখে চায় ব্যাগের দিকে। খেয়া বোঝে।

কি ও?

ওষুধ।

বের কর না।

না, থাক্—পলক বলে।

খেয়া গিয়ে ব্যাগ খোলে, চ্যাপটা শিশি বেরিয়ে আসে। খেয়া হাসে, বলে, এ নইলে ঘুম হয় না আমার।

এক চুমুক খেয়ে খেয়া বলে—আঃ! পলক ভাবে এ যেন তার মর্ম্ম-ছেঁড়া রক্তধারা খেয়া পান করছে। শিশির ওষুধ ফুরোয়। ছোলা ভাজা ফুরোয় না। জান্‌লা দিয়ে খেয়া ফেলে দিয়ে বলে যাক্‌গে।

মেলট্রেণ চলে হুস্ হুস্। পলক Bel Ami খুলে বসে, পড়ে না। আর বেঞ্চে Heptamronএর পাতায় চোখ বুলোয় খেয়া—মাঝের ফাঁকটুকু যেন একটা নদী, এ পারে তার চখা ওপারে তার চখী।

দুঃখী পলক বই পড়ে না ফাঁকটির দিকে চেয়ে কাঁদে। খেয়া দেখে উঠে আসে, বলে, কাঁদ্‌ছ! ছি লক্ষ্মীটি!

পলক চোখ মুছে বলে, না। খেয়া বলে কাল সন্ধ্যেবেলায় লক্ষ্ণৌ নাম্‌ব। আরো আঠারো ঘণ্টা।

পলক চমকে বলে—এত শীগ্‌গির!

খেয়া বলে,—তোমার কাছে লুকোব না। বিয়ে হয়েছে আমার অনেক দিনই। যাচ্ছি বাবার কাছে একাই, যাওয়া আসা একাই করি।

পলকের মুখ শুকোয় বলে, তুমি পরের !

পলকের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে খেয়া ; বলে আমি তোমার ! আমি তোমার ! এই আঠারো ঘণ্টার জন্যে আমি তোমারি ! জীবনটা ত ছোট নয় অনেক বড় ! একটা যেন বড় বাগান, তার সব ঋতুতেই, সকল রাতেই ফুল ফোটে। তার একটা ঋতুর—একটা রাতের ফুল আমি তোমায় দিলুম—ব'লে গরম চুমোয় পলকের মুখ ভাপ্‌সে দেয়। দুঃখী পলক খেয়ার বুকে এলিয়ে পড়ে—যেন ঝড়ো দাঁড়-কাক তার নীড় পেয়েছে !

ঝড়ের রাত পুইয়ে যায়, সকাল হয় ; সূর্য্যি উঠে।

চারটে বাজে। লক্ষ্ণৌ এল ! পলককে বুকে টেনে চুমু দিয়ে খেয়া বলে এইটি আমার শেষ ফুল। নতুন ফুল ফুটবে আবার লক্ষ্ণৌ গিয়ে, সন্ধ্যে হলে। তখন তুমি কোথা ! পথের খেলা পথেই শেষ। আবার নতুন পথে নতুন পথিক, নতুন পরিচয়। পলকের হাত-পা টাটায়, কথা কয় না।

লক্ষ্ণৌ—!

যাবে কোথায় ?—পলক শুধোয়।

আমার বাবা নিতাই রাহা—খেয়া বলে।

পলক একটু থামে, শেষে বলে, নাম শুনেছি, দেখিনি। আমার মামা।

খেয়া হাসে, বলে—কি হয় তাতে ? ঝড়ের রাতের আইন আছে ?

লতায় লতায় গাছে গাছে হামলা-হামলি,—কোন্ পাখী কার নীড়ে ছিট্‌কে পড়ে, কোন্ বিহগীর পাখার তলায় কোন পাখীটি রাত কাটায়,

ঝড়ের রাতের অন্ধলীলা কেইবা দেখে? সকাল হ'লে যে যার নীড়ে ফিরে চলে তাই না?

দুঃখী পলক! পলক বলে,—হায়! ঝড় যদি চিরকাল রইত!

ঝড় যে দম্‌কা আসে, দম্‌কা যায়—খেয়া বলে।

মেলট্রেণ আর চলে না, থামে। লক্ষ্ণৌ!

খেয়া দরজা খুলে বলে—ঝড়ের রাত ভোর হ'য়েছে, এখন আবার যে যা ছিলুম। এস দাদা!

পলক নিশ্বাস ফেলে, বলে পথের স্বপন শেষ হয়েছে। চল বোন! ব্যাগ হাতে পলক নামে, দুঃখী পলক, ঝড়ের রাতে ঝ'রে পড়া যেন একটা কুমড়ো ফুল,—পাঁপড়ি খসা—কাদা মাখা।"

দরবেশ

["বাস্তবিকা"র হেমন্ত সংখ্যায় আরও একটি গল্প ছিল, সেটি পড়িলাম। আপনাদের অবগতির জন্য আদ্যন্ত উদ্ধৃত করিলাম।

—শ্রীদিবাকর।]

দরবেশ

হাঁসের মা বিয়োয় কিন্তু পালে না; তার জমাট-বাঁধা শুভ্র স্নেহ ডিমগুলি যায় চেরাগ-চাচার সরাইখানায়। সেথায় পেঁয়াজ বাটার সোহাগ মেখে সান্‌কি ভরে গড়ায় তারা।

সেথায় সন্ধ্যা হ'লে পেয়ালা বাজে—ঠিনিক্ ঠিনি, উছ্‌লে পড়ে দ্রাক্ষা-ফলের কলজে-খোঁড়া খুনের ধারা, ইন্দ্রপুরীতে যেন সুধার স্রোত বইছে।

দুখ-বেদনার পাষাণ ভারে নুয়ে প'ড়ে মর্ত্ত্যের অমরেরা আসেন সেথায় সন্ধ্যা হ'লে, দুঃখের বোঝা ডুবিয়ে দিতে দ্রাক্ষারসের সুধার স্রোতে।

এমনি চলে নিত্যদিন চেরাগ-চাচার সরাই খানায়—চেরাগ জ্বলে সন্ধ্যা হ'লে, এঁদোটিলা গলির মোড়ে।

পশ্চিমের সেই ঘেঞ্জি সহর। অদূর পথে বেদন চলে বাউল-বেদন। ঘর ছেড়েছে তিনটি মাস, বিষের ব্যথায় চলে কোথায় কেউ না জানে! তিনটি মাসের দীর্ঘশ্বাসে শুকিয়ে গেছে ঠোঁট ছুটি, উদাস হাওয়ায় অলক দোলে...বেদন চলে।

সেদিনের সেই নিশুত রাত্তি, তারি স্মৃতি ফেনিয়ে ওঠে মনে-প্রাণে।

কেউ বলে নেক্‌জান, কেউ বলে রঙ্গবিলাসী,—তারি কথা। স্রোতের ফুল ভেসে এল দীন্নুমুচির কুটীর-দ্বারে, কোন নিশীথে কেউ না জানে। তারপরে এক বর্ষা-রাতে ভেসে গেল প্রাণের স্রোতে ছিদাম মূদীর মুদীখানায়। রূপের জোয়ারে কানায় কানায় মুদীখানা ভরে উঠল। শেষে শিউলী-ফোটা শরৎ এল। মুদীখানা আঁধার হোল। ময়রা যতুর খোলার চালা আলো ক'রে বস্‌ল সে! পরিচয় সেই থেকে।

গেঁয়ো স্কুলের থার্ড মাষ্টার। সে পথ দিয়ে গতায়াত সকাল সাঁঝে। রোজ ছুবেলা চোখোচোখি। শেষে পথে আস্‌তে যেন খিদে পায়, পেটে সন্থ খাওয়া পান্তাভাত গজগজায়; তবু খায় তিন পয়সার মোণ্ডা কিনে। রঙ্গবিলাসীর হাতে ছোঁওয়া মিঠে মোণ্ডা বেশী ক'রে মিঠিয়ে ওঠে—

থার্ড মাষ্টার বাঁশের মাচায় ব'সে খায় আর অশ্রু ফেলে। ছু'দিন বাদে ময়রা যতুর হুঁকো টানে। রঙ্গবিলাসী তামাক সাজে। হেড্‌ মাষ্টার শোনেন সব, ধমক দিয়ে গোঁজ হ'য়ে বসেন, ছেলেরা আড়ালে গা টেপাটেপি করে, আকুল বেদন বুঝ্‌তে নারে ফ্যাল্‌ফেলিয়ে চেয়ে থাকে।

সাড়ে বার টাকা মাইনে,—মাসের কামাই হাতে নিয়ে থার্ড মাষ্টার আসে। রঙ্গবিলাসীর হাতে তুলে ছায়।

রঙ্গবিলাসী হেসে বলে, "কি হবেক্ ?" বেদন বলে, "থাকুক্ জমা। সবই তো তোমার কাছে—"

রঙ্গবিলাসী বোঝে না, টাকা পেটরায় তোলে। শেষে বলে, "বামুনের টাকা মুই রাখ্‌তে পার্‌বক্‌নি, ফেরৎ লিও কিন্তুক্—"বেদন নিশ্বাস ফেলে। বড় ভালো লাগে ওর ওই আধোআধো কথা, ওর ওই উল্‌কী-আঁকা মুখ-ফেরানোর ভঙ্গীটী—যেমন ভাল লাগে দেখ্‌তে—পথের ধারের জলবিছুটী, খ্যাঁক-শিয়ালী।

এমনি করে বছর ঘোরে, বেদন নিত্য আসে নিত্য যায়। রঙ্গবিলাসী দেয় না ধরা—

চঞ্চলা যেন লক্ষ্মী। শেষে সেদিন সাঁঝে একটু বেশ ছোঁওয়া দ্যায়, একটু যেন বেশী হাসে, বলে, "তোমার টাকা কাল লিও কিন্তুক্—" মুখ ফেরায়, মুচ্‌কি হাসে।

বেদনের ব্যথা লাগে। বলে, "কে চায় টাকা, যাকে চাই—" রঙ্গবিলাসীর গালে ছোট্ট একটি ঠোনা দ্যায়—সেই তার প্রথম ঠোনা—আঙ্গুল কাঁপে!

সেদিনের সেই নিশুত রাতি—শাওন ঝরে অঝোর ধারে! সাঁঝের সেই পরশটুকুর পুলক-দাহে বেদন জাগে সারানিশি—দূর আঁধারে ময়রা যত্নর দোকান পানে চায়—শুধু ডুক্‌রে কাঁদে।

রাত পোহায়।

ময়রা যত্নর কুটির দ্বারে বেদন দাঁড়ায়। যত্ন বাইরে আসে—জলে ভেজা চোখের পাতা। "রঙ্গবিলাসী—"? পুছে।

"সর্ব্বনাশী!" যত্ন চেঁচায়। কাল নিশীথের অন্ধকারে ময়রা লক্ষ্মী

কোন নব বৈকুণ্ঠের পানে অভিসার করেছে যদু তা জানে না। তারি সাথে সবই গেছে।

রেখে গেছে তারি শোওয়ার মাদুর খানা...পুলক স্মৃতির অগ্নিকণা। যদু সেদিকে চায়—চোখে তার আগুন ছোটে, দাঁত খিঁচোয়, বোনের রোদন আসে...ছিদামের দোকানে দেনা, আটাশ টাকা তেরো আনা!

সেদিন থেকে বেদন বাউল। সেদিন থেকে অচিন্ পথে চলা সুরু। হাটেবাটে খুঁজে ফেরে বাউল বেদন—রঙ্গবিলাসী। কার আঁধার ঘরে হীরা জ্বলে...তাই ভাবে আর নদীর চরে, বিলের ধারে ব্যর্থ খোঁজে!

শেষে পশ্চিমের সেই ঘেঞ্জি সহর। কতই দ্যাখে। গয়লানীরা দই বেচে, ময়নাটিকে ছাতু খাওয়ায় চুড়ি-ওলী, বেণের মেয়ে ময়দা মাপে, মুদীয়ানী বেগ্নি ভেজে পাহাড় করে...বেদন দাঁড়ায়—বাউল বেদন সবার পানে ব্যাকুল চোখে চেয়ে দ্যাখে, দ্যাখা ফুরোয় না। শেষে সন্ধ্যা হ'লে আবার চলে, ধর্ম্মশালায় মায়ার টানে।

সেদিন পথ ভোলে।

চেরাগ-চাচার সরাইখানায় দুয়ার-তলে প্রদীপ জ্বলে—সেথায় থম্‌কে দাঁড়ায়।

জগতের দুখ-ভোলান বুকজুড়ানো তরল মায়া গেলাস-ভরা। বেদন ফোঁপায়।

বোরকা-ঢাকা নারী আসে গেলাস হাতে। দ্বারে এসে একটু দাঁড়ায়, অতি ধীরে পুছে, "বাঙালী?"

বেদনের শুক্‌নো গলায় একটি ছোট 'হুঁ' শুকিয়ে ওঠে।

"ভিত্‌রি এ্যে ...

"পয়সা নেই," বেদন বলে—ব্যথার সুরে।

নারী বেদনের হাত ধরে—"জলদি এসো! আণ্ডা তাজা, আর দু' চুমুক। একটু বাদে ভিড় হবে।" বেদনের কাঁদন আসে। নারী বলে, "বাঁকুড়ো জেলায় বাড়ী। হেথায় বাঁদি সরাইখানায়।"

তুমি বাঁদি! হায় নিয়তি!—বেদন বল্‌তে চায়। পরে বলে, "তুমি উর্ব্বশী—এই ইন্দ্রপুরীর রম্ভা তুমি—"

নারীর কথা ফুরোয় না, কতই বলে। বেদনের গলার আওয়াজ জড়িয়ে আসে, উঠে বলে, "চলি তবে ?"

নারী হাত ধরে "সে কি? আমার গরীবখানায় যেতে হবে। তিনদিন পরে দেশের মানুষ পেনু যদি—"

* * *

রাত দুপুরে বেদন চলে—তার হাত ধ'রে চলে উর্ব্বশী—। আঁকা-বাঁকা গলির পথে—নিশুত রাতে।

পচা ভাঙ্গা থুথ্‌ড়ো বাড়ী—তিন কামরা, অন্ধকারে যক্ষ্মা রোগীর মত ঝিমোচ্ছে। বেদন হোঁচট খায়, নারী বলে, "আহা ষাট।"—এত সোহাগ! বেদন কাঁদে।

ঘরে দীপ জ্বলে না। বেদন বলে, "নাই বা জ্বলুক—তোমার রূপের ছটায় আলো হবে।" জাজিম পাতা। ক্লান্ত তনু এলিয়ে দ্যায় বাউল বেদন। নারীর কত কথা—দুঃখ-সুখের! বলে,—"আমার ভরা ঘরে যেটুকু ফাঁক ছিল আজ ভরেছে"—বেদনকে বুকে টানে। বেদন কাঁদে, বলে, "রাত যদি পোহায় ?"

"এ-রাত আস্‌বে আবার, যাবে না"—নারী বলে।

"তাই হোক্ গো, তাই হোক্! নিত্য কালের মতন তুমি আমায় নাও। আর কিছু নেই, শুধু আমি আছি"—বেদন বলে। রাত পোহায়। বেদন উঠে বসে, চোখ মুছে। নারী আসে—বলে, "আমার ভরা ঘরের নূতন মানুষ—এই নাও!" তিনটি শিশুকে বেদনের দিকে ঠেলে দ্যায়, বেদন চমকে বলে, "কি এ?"

নারী বলে "বাপের আদর পায়নি এরা, বাপ দ্যাখেনি বনের ফুল!" শিশুরা বেদনের বুকে-পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে, চেঁচিয়ে ওঠে, "বাপজান।" বেদন কাঁপে, নারী বলে, "প্রথম মেয়ে কোলে ক'রে ঘর ছাড়ি। তারপর দশটা বছর হেথায় সেথায়। শেষে এসে সরাই-খানার বাঁদী...হেথা থেকে মেয়ে পালায়। তারপর এই এরা এল—আজ এরা তোমার।"

ছেলেরা বেদনের গলা ধ'রে আদর করে, চুমু খায় গালে—"বাপজান!"

বেদন শিউরে ওঠে, হাত-পা আসে ঠাণ্ডা হয়ে। মাথা নুয়ে আসে।

নারী হাসে, বলে,—"সরম কিসের?" আমার সাথে এদের পেলে মাগনা...ফাউ। এমন বরাত আমার হবে তা জানি না! তোমায় পেনু—মেয়েও সেদিন ফিরল ঘরে,...ওই আসে।"

মেয়ে ঘরে ঢুকে মিহিন সুরে ডেকে ওঠে...যেন দোয়েল!—

"বাপজান!" বেদন চমকে চায়...রঙ্গবিলাসী—

দুজনে চোখোচোখি! মেয়ে বুকের কাপড় মুখে গোঁজে...বেদন ভিরমি যায়। নারী মুচকে হাসে, পুছে—"জামাই বুঝি?" রঙ্গবিলাসী কথা কয় না...খিল খিলিয়ে হেসে ওঠে।

সন্ধ্যা হ'তে বেদন জাগে। গলির পথে দাঁড়ায়। সেদিন থেকে বেদন দরবেশ। আবার অচিন পথে যাত্রা স্বরু, কিসের টানে কেউ না জানে!

হরিকুমারের বক্তৃতা

["বাস্তবিকার" ঋতু-অধিবেশনের একখানি রিপোর্ট পাইলাম রিপোর্টখানি পাঠাইতেছি।]

"বাস্তবিকা"র ঋতু-অধিবেশন

আশ্বিনের সপ্তম দিবস

স্থান—কুমারকুঞ্জ

যাঁরা ছিলেন—

কুমারী ভূমিকা ভৌমিক।

" পলাতকা পালিত।

" সাহারা সাহা।

" চিড়িয়া চক্রবর্ত্তী।

" নূপুর নাগ।

" বলাকা বটব্যাল।

" কেদারা কাঞ্জিলাল।

" পূরবী পুরকায়স্থ।

কুমারী ক্ষণিকা খাঁ।
” তুলিকা তলাপাত্র।
কুমার কুমার রায়।
” শিথিল সেন।
” রাতুল রাহা।
” নিমেষ নাগ।
” নিমীলিত নন্দী।
” দলিত দাম।
” চকিত চাকী।
” গহন গুহ।

(ভাষণ—শ্রীকুমার রায়। অনুলেখন—শ্রীশিথিল সেন।)

দেখ্‌তে দেখ্‌তে চ'লে গেল ছুটিমাস—একটি ঋতু। মেঘ আর ঝঞ্ঝার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হ'য়ে ধরণী জননী আজ তাঁর নবীন প্রণয়ী নীল আকাশ আর কাশফুলের ঘরে বধূবেশে প্রবেশ কর্‌লেন। দোয়েল আজ যে ঘেঁটুবনে সানাই বাজিয়ে গেল, পচা কচুপাতার নীচে মুখ লুকিয়ে ঝিঁঝিঁ-বৌয়েরা দিয়ে গেল উলু—তা কি কেউ শুনেছে? কেউ কি তা শুন্‌তে চায়? জগৎ ব্যস্ত শুধু বিদ্রূপ নিয়ে, শুধু কথার কাটাকাটি, শুধু লেখার মাতামাতি। শুধু আমরা কটি প্রাণী ধরণী জননীর নব মিলনের বরণডালা সাজিয়ে ধ'রে ব'সে আছি। আমরা বিদ্রূপে টলিনি, নিন্দায় গলিনি, সবুজের বিরুদ্ধে যে অভিযান হাজার লেখনীর সঙ্গীন উঁচিয়ে আস্‌ছে—তা দেখেও ডরাইনি! আমরা বেঁচে আছি, বেঁচে থাক্‌ব! (করতালি) আজকের এই সভায় অনেক কিছুই বল্‌বার

আছে, কিন্তু ভাষা নেই। যে-ভাষায় আমাদের দেশের লোক কথা বলেছেন এতদিন, সেই ঘুণে-ধরা ভাষা, তার সেই শব্দ, তার সেই অলঙ্কার অভিধান হৃদয়ের এই অকথিত বাণীর ভার বইতে তো পারে না, তবু দশ জনের কাছে আমাদের মনের বাণী পৌঁছে দিতে হবে, তাই আমাদের বল্‌বার কথা সব এই ভাষাতেই আরও কিছুকাল বল্‌তে হবে হয়তো।

দু'মাস গেছে। এই দু'মাসে যা কিছু ঘটেছে—তার একটু ছোট্ট হিসাব দেওয়া দরকার নয় কি ?

(নিশ্চয় ! নিশ্চয় !)

বলি তবে ? শুনে হয়তো আনন্দ হবে আপনাদের যে সবুজের জয়যাত্রা চঞ্চল শুধু সাহিত্য-জগৎকে করে নি, রাষ্ট্রজগৎকেও বিচলিত করেছে। সবুজের জীবন-উৎসের মুখে ভেসে যেতে বসেছে আজ কৃষি আর বাণিজ্য, আর অতিবৃদ্ধ রাষ্ট্র হতাশায় সবুজের এই জয়োৎসবের দিকে চেয়ে বসেছেন মাথায় হাত দিয়ে। রাষ্ট্রের অখিল ধ্বংস প্রয়াসকে ব্যর্থ ক'রে দেশের নিখিল জীবন-ধারাকে দখল ক'রে বসেছে আজ সবুজের অগ্রপথিক কচুরী পানা ! কচুরী পানা ! কচুরী পানা !! বিশ্বের অমর অফুরন্ত জীবন-লীলার এ তো মূর্ত্ত প্রতীক। এ তো আমাদেরি ভাই, আমাদেরই দোসর ! এ তো শুধু তৃণ গুল্ম নয়, এ যে আমাদের একান্ত আপনার জন। আজ কচুরীপানা জগতে সবুজের অভিযানের ভবিষ্যৎ সূচনা কর্চ্ছে না কি ? সে আজ অফুরন্ত বেগে অনন্ত জীবন ছড়িয়ে যাচ্ছে। শুধু নদীর ভরা-যৌবনের রস পিয়ে সে আপনার জীবনকে তো সমাপ্ত করেনি, খাল বিল ডোবা নালার পঙ্ক-

রসও তো আমাদের মতোই শুষে নিচ্ছে। তাই আজ তার সঙ্গে অনুভব করি একটি মমতার বন্ধন—সখ্যের শৃঙ্খল। তার ওই স্নিগ্ধ সবুজ প্রসারিত পর্ণগুলির মধ্যে আমাদেরই মত ক্ষুধা নেই তা কি জোর ক'রে বল্‌তে পারি আর? কিন্তু এই দু'মাসের মধ্যে দেখ্‌ছি নিখিলের এই অফুরন্ত জীবন-বিগ্রহের বিরুদ্ধে চলেছে অভিযান ক'রে রাষ্ট্রের প্রবীণ পক্কবুদ্ধি, কিন্তু তাতে শঙ্কিত হবেন না যেন আপনারা, সবুজের বিরুদ্ধে সত্যের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে, নিষ্ফল হবে...নিশ্চয়।

(করতালি)

তেমনি নিষ্ফল হবে জরাগ্রস্ত সাহিত্যের আস্ফালন...এও নিশ্চিত। মাসিক থেকে আরম্ভ ক'রে দৈনিক সাহিত্য পর্য্যন্ত সবুজের প্রভাব থেকে মুক্ত আছে কিছু, তা কি কেউ বল্‌তে পারে? ভবানীপুর থেকে আরম্ভ ক'রে লক্ষ্ণৌ...সর্ব্বত্রই কি সবুজের জয়ধ্বনি উঠছে না? আইনের মগজে সবুজ তো বাসা বেঁধেছিল অনেকদিন। আজ অর্থনীতির অঙ্ক-সঙ্কুল মর্ম্ম-কোঠায়ও সে নিঃশব্দ অভিযান করেছে, শোনেন নি কি?

(জয় সবুজ! জয় সবুজ!)

কিন্তু এই বিজয়-অভিযান—এই পরম কল্যাণ-প্রয়াসকে ব্যর্থ কর্ব্বার চেষ্টাও তো দেখ্‌তে পাচ্ছি প্রত্যহ। আমরা যে কথা কই...সবুজের প্রাণের যে সুরে—তার মর্ম্মের যা কাহিনী তা না কি সাহিত্যধর্ম্মের সীমা অতিক্রম ক'রে চলেছে। জানিনে। সাহিত্য-ধর্ম্মের সীমানা জরিপ ক'রে দেখেছে কি কেউ? কেউ না। তবু কেন এ প্রশ্ন— সাহিত্য-ধর্ম্মের সীমানা কোথায়?

উত্তরে যদি বলি চিৎপুরের চৌরাস্তায়—তবে কি ভুল হবে নিতান্তই?

যদি বলি, এই হেথাকার ঘরে ঘরে নিশীথ-রাতের ঘুঙুরের রণ-রণিতে সাহিত্য-দেবতার পূজার ঘণ্টা বাজ্‌ছে, যদি বলি গৃহস্থ-ঘরের বিধবা-বৌয়ের গোপন আলমারীর চ্যাপ্‌টা শিশিতে সাহিত্য-দেবতার অর্ঘ্য-পাদ্য সঞ্চিত হ'য়ে আছে, বলি যদি অজানা-বাপের-দেওয়া মায়ের কোল-জোড়া খোকা-খুকীরাই তাঁর পূজার বিল্বদল, যদি বলি ও-বাড়ীর ওই ঘর-ছেড়ে-বেরিয়ে-আসা বৌটির জ্বল্‌জ্বলে ক্ষুধায়-ভরা চোখদুটিই তাঁর পূজায় ঘৃত-প্রদীপ, আর স্নানের ঘাটে বারেক-দেখা নাম-না-জানা অনামিকার, আর রুদ্ধ ঘরে ক্ষুধিত তৃষিত সাধকের দীর্ঘনিঃশ্বাসেই সাহিত্যদেবের স্তববাণী গুঞ্জরিত হচ্ছে, তবে অন্যায় হবে কি কিছু ?

(না, না !)

না, ঠিক্ না। সাহিত্য-দেবতার পূজার দেউলে নীতি-ধর্ম্মের ভাঙ্গা ঝাঁঝ কাঁসর চিরকালটাই বাজ্‌বে কি ? মানুষের মনের গোপন-বীণার রাগরাগিণীর ফুলঝুরি তাঁর পূজায় লাগ্‌বে না, এ কথা কেউ যদি বলে তবে কি তা মেনে নেব ? মেনে পারি কি নিতে—মনের নিভৃত-জগতের উপর চিরদিনকার এই অবিচার ? তার তৃষা-লালসার বেদনার যত গোপনলীলা সবি কি মিথ্যে ? শুধু বাইরের ঘসা-মাজা রূপটাই সত্যি কি ? সেইটিই তো মিছে। বাল্মীকি ব্যাস কালিদাস সবাই তো এই মিথ্যার বেসাতি করেছেন—সবাই নীতি-ধর্ম্মের ছলনার ব্যাপারী সেজে বাহবা পেয়েছেন, এ কথা বল্‌তে দ্বিধামাত্রা হচ্ছে না আমার। কত সত্যকে গোপন ক'রে গেছেন তাঁরা, আমাদের চার-পাশের সজীব জগৎকে দেখে তা বুঝ্‌তে পাচ্ছি কতক আজ। সত্য পালন কর্ত্তে রাম বনে গেলেন সীতার সঙ্গে—তাঁদের অনুগামী

হলেন লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণের এই বনযাত্রা শুধু কি ভাইয়ের সেবারই আকাঙ্ক্ষায়? ভ্রাতৃবধূটির লীলাচঞ্চল ভরা-দেহের নির্ব্বাক আকর্ষণ লেশমাত্রও কি তাতে ছিল না? মুখ ফুটে সে কথা বাল্মীকি বল্‌তে পারেন নি, স্বপ্নেও কল্পনা কর্ত্তে পারেন নি কেউ। কিন্তু হয়তো খদির কুঞ্জের পর্ণ-শয়নে শুয়ে কখনো লক্ষ্মণ পম্পা-নীরে স্নানরতা সীতার দিকে নিমীলিত অপাঙ্গে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন, বনমর্ম্মরে সে ব্যথার নিঃশ্বাস মিলিয়ে গিয়েছিল, বাল্মীকির কাণে তা পৌঁছেনি। হয়তো লঙ্কায় অশোককুঞ্জে কোনোদিন রামপ্রিয়ার অন্তরেও এই ব্যথিত তপস্বী দেবটির জন্যে ক্রন্দন ঘনিয়ে উঠেছিল—আর হয়তো মন্দোদরী তা অনুভব ক'রে মুখ ফিরিয়ে গৃহ-ছাড়া দেবর বিভীষণের জন্যে এক বিন্দু অশ্রু বাঁ হাতের করতলে মুছেছিলেন। কোনো দিন হয়তো পাঠরত অভিমন্যুর স্নিগ্ধমুখে বাতায়ন-পথে লুটে পড়েছিল প্রভাত রবির আলো, আর তাকে দুধ খাওয়াতে এসে বিমাতা দ্রৌপদী থম্‌কে দাঁড়িয়েছিলেন, অতর্কিতে তাঁর বুকের কৃত্রিম আবরণ খ'সে পড়েছিল। পরক্ষণেই হয়তো ফুলের সাজি নিয়ে অভিমন্যুর জনক-স্বামী অর্জ্জুনের চরণ পূজা কর্ত্তে গিয়েছিলেন কৃষ্ণা—সে পূজার ফুল বাইরের দৃষ্টিতে অর্জ্জুনের চরণই অর্চ্চিত করেছিল বটে, কিন্তু মনের পূজা কাকে দিয়েছিল সে নারী সেদিন—সে সত্যকথাটি বল্‌তে সত্যবাদী ব্যাসও হয়েছেন কুণ্ঠিত। দুর্য্যোধন দেখ্‌তে কেমন ছিলেন জানিনে, কিন্তু গান্ধারীর এই প্রথম খোকাটি দেখ্‌তে অনেকটা তাঁর ঠাকুর পো পাণ্ডুর মত হয়নি, সে কথা কে বল্‌বে? অথচ এ সব কথা বল্‌তে অতীতের কবিদের বেধে গেছে। অতীতের এই বাধা—বাঁধন-কাটা শিকলছেঁড়া

বর্ত্তমানে ঘুচিয়ে, উধাও-ধাওয়া অনাগতে একেবারে মুছিয়ে দিতে হবে আমাদের।

(স্বস্তি ! স্বস্তি !)

এ কথাগুলো দেশের চল্‌তি ভাষায় বল্‌তে আজ বাধছে, কিন্তু এই ভাষার বাধা, শব্দের বাঁধনও ঘোচাব আমরাই—আজ আর নয়।

শরতের সায়াহ্ন রক্তিম হ'য়ে উঠেছে, দেখ্‌তে পাচ্ছি অনেকগুলি শুষ্ক বদন তারি রক্তচুম্বনে উঠেছে আরক্ত হ'য়ে (এই সময় কুমারী সদস্যেরা আনন আনত করিলেন), সন্ধ্যার তিমির এই রক্তকমলগুলিকে ম্লান কর্ব্বার পূর্ব্বেই সভাভঙ্গ হোক্।"

(আসন গ্রহণ)

অতঃপর কবি-সভাপতিকে কুমারী নূপুর নাগ ও সাহারা সাহা মাল্যচন্দন দিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভা ভঙ্গ হইল।

দিবাস্বপ্ন

ঠান্‌দির তপস্যা

যদু মাইতিকে কিছু টাকা ধার দিয়াছিলাম। সুদে আসলে টাকা হইয়াছে দুই শত পঁচাত্তর। কন্যার বিবাহ আসন্ন, টাকাটা আদায় করা যায় কি না দেখিবার জন্য দুই দিনের ছুটি লইয়া যাত্রা করিলাম। একবার বাড়ী হইয়া যাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল ; কিন্তু সময়ে কুলাইবে না ভাবিয়া একেবারে যদু মাইতির গ্রাম নারাঙ্গিতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ছেলেবেলায় অনেক দিন এই গ্রামে কাটাইয়াছি, দুই এক ঘর আত্মীয়ও আছেন। কৃত্তিবাস দাদা ওরফে কৃত্তিদা'র বাড়ী সেকালে আমার আপনার বাড়ীর মতই ছিল। গ্রাম-সুবাদে তিনি দাদা মহাশয়। তাঁহার স্ত্রী জগদম্বা ঠাকুরাণী ওরফে রাঙ্গাদি'র সহিতই আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল বেশী। কৃত্তিদা' যখন কলিকাতায় থাকিয়া ময়দার আড়তে চাকুরী করিতেন তখন রাঙ্গাদি'র পত্রলেখক ছিলাম আমি। 'সচিত্র প্রেমপত্র' খুলিয়া এক একখানি চিঠি আদ্যোপান্ত নকল করিয়া পাঠাইতাম। কলিকাতা হইতে কৃত্তিদা 'স্বামীর পত্র' হইতে চিঠি উদ্ধৃত করিয়া জবাব দিতেন। সে অনেক দিনের কথা। ময়দার

আড়তের চাকুরী ছাড়িয়া ক্বত্তিদা’ কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন, সম্প্রতি একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়াছেন শুনিয়াছি। রাঙ্গাদি’র সহিতও অনেককাল দেখা নাই, তবে শুনিয়াছি ক্বত্তিদা’ তাঁহাকে লেখা-পড়া শিখাইয়াছেন। সন্তানাদি হয় নাই! কাজেই এদিকে বিঘ্নও কিছু ছিল না। রাঙ্গাদি’ রাঁধিতেন ভাল, তাঁহার হাতের পিঠাপুলির আস্বাদ এখনও ভুলি নাই। তৃতীয় রিপুর দ্বারা চালিত হইয়া এখনও রাঙ্গাদি’র আশ্রয়েই চলিলাম। অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া বাড়ীর একটি প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তন চোখে পড়িল। ঠিক্ মাঝখানটায় সেকালে একটা আম গাছ ছিল, তাহার নীচে বসিয়া বৈশাখ মাসের ছুটিটা নুন লঙ্কা সহযোগে বিস্তর কাঁচা আমের সদ্গতি করিয়া কাটাইয়াছি। সম্প্রতি সেখানে একটি ঝাঁকড়ামাথা ‘নাইট কুইনের’ গাছ। আঙ্গিনায় জনপ্রাণী নাই, আটচালার বারান্দায়, যেখানে রাঙ্গাদির রামছাগলটি বাঁধা থাকিত, সেখানে একটি লোহার খাঁচা ঝুলিতেছে। তাহার মধ্যে বসিয়া একটি টিয়া ছোলা খাইতেছে দেখিলাম। আমাকে দেখিয়াই টিয়াটি চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, ‘ওরে সবুজ ওরে আমার কাঁচা।’ এ কি! এই কথা কয়টি বাস্তবিকার সদস্যদের মুখে বার বার শুনিয়াছি, গ্রামের টিয়া এ কথা শিখিল কোথা হইতে? কিছু বুঝিতে না পারিয়া ডাকিলাম, “রাঙ্গাদি! ও রাঙ্গাদি!” কোনও সাড়া পাইলাম না। আবার ডাকিতেই দালানের দরজা খুলিয়া তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। পাঁচসাত বৎসর দেখাশোনা না থাকিলেও দেখিয়াই বুঝিলাম রাঙ্গাদিদি স্বয়ং। রাঙ্গাদিদির গায়ের রং যেন আরও একটু ফর্সা হইয়াছে, কপালের প্রকাণ্ড গোলাকার

সিঁদূরের কৌটার স্থানে দেখিলাম অতি ছোট একটি খয়েরের টিপ ; বাঁ হাতে একখানি বাঁধানো খাতা, ডান হাতে ফাউণ্টেন পেন। বুঝিলাম রাঙ্গাদিদি লেখাপড়া করিতেছিলেন। রাঙ্গাদিদি আমাকে চিনিলেন, কহিলেন, "সেকালের বন্ধু যে এস এস!" রাঙ্গাদি'র নিকট হইতে এমন মার্জ্জিত অভ্যর্থনা লাভ ইতিপূর্ব্বে আর ঘটে নাই। বরাবর দেখা হইলেই শ্যালক সম্বোধন করিয়া কান ধরিয়া টানিয়াছেন, আজ তাই মনটা বেশ রসস্থ হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলাম "কেমন আছেন রাঙ্গাদি'?" হঠাৎ রাঙ্গাদির মুখখানি যেন একটু ভার হইল, একটি ছোট নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "রাঙ্গাদি! আজও ভুলিস্‌নি এ-ডাক?"

ভয় পাইয়া কহিল, "কেন কি হ'য়েছে?" রাঙ্গাদি' ধীরে ধীরে কহিলেন, "যা হ'য়ে থাকে তাই! ছেলেবেলায় বাপ্‌ মা যার নাম দিয়েছিল 'খুকী'—সে চিরকাল 'খুকী'ই র'য়ে যায়। যোলটি বসন্ত যখন তার প্রতি অঙ্গে ফুল ফুটিয়ে দিয়ে যায় তখনও সে খুকী। যখন সে আরও দু'চার্‌টে খুকীকে সংসারে আনে তখনও সে তাই, তখনও জগৎ তাকে ডাকে খুকী! তার অন্তর-পুরুষ বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে, সমস্ত যৌবন সঙ্কুচিত হ'য়ে যায় তবু জগৎ তাকে বিদ্রূপ কর্ত্তে থাকে 'খুকী'! 'খুকী'!" রাঙ্গাদি' এসব শিখিলেন কোথা হইতে? এ যেন শ্রীমান্‌ হরিকুমারের তত্ত্বব্যাখ্যার মত শুনিতেছি। ঠাওর করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "তা হ'লে ডাক্‌ব আজ কি নামে?"

রাঙ্গাদি' তাড়াতাড়ি কহিলেন, "সখী, শুধু সখী। আমরা সবাই সখা আর সখী, এ ছাড়া এজগতে আর আমাদের পরিচয় নেই। বলো

সখী।" ভয়ানক ঘাবড়াইয়া গেলাম। ঠান্‌দি' আমার দিকে চাহিয়া হাত ধরিয়া টানিয়া কহিলেন "এস বন্ধু! ঘরে এস!" নীরবে ঘরে ঢুকিলাম। সেকালের সে আসবাব-পত্র ঘরে কিছু নাই। যে কোণটিতে লক্ষ্মীর ঝাঁপি ছিল সেখানে একটি 'টিপয়' তাহার উপরে ফটোগ্রাফ; কৌতূহলী হইয়া অগ্রসর হইলাম। হরিকুমারের ছবি! হরিকুমারের ছবি এখানে আসিল কি করিয়া! রাঙ্গাদি' সম্ভবতঃ আমার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কহিলেন "বিস্ময় জাগছে মনে কি? গত বচ্ছর এসেছিলেন তিনি, আমাদের প্রাণগুরু। তাঁরই সাথে এসেছিলেন কল্‌কাতা থেকে, তাঁর হৃদয়ের নব জন্মোৎসবে যোগ দিতে!" চোখ সম্ভবতঃ অত্যন্ত বিস্ফারিত হইয়াছিল। রাঙ্গাদি' কহিলেন, "আশ্চর্য্য হচ্ছ সখা! ভাব্‌ছ কি বল্‌ছি! ঠিক্‌ই বল্‌ছি। তোমরা যাকে বল 'জুবিলী' আমরা তাকে বলি জন্মোৎসব। বয়স আমাদের নেই, বয়সের মাপ-জোকও রাখিনে, প্রয়োজনও নেই তার। প্রাণ আমাদের চিরকাল একই র'য়ে যায়, বর্ষে বর্ষে তার নবজন্ম হয়, প্রতিবর্ষে আমরা তার নব জন্মোৎসব ক'রে থাকি! গত বৎসর এই নব জন্মোৎসবে এসেছিলেন তিনি—"ঠান্‌দি'তর্জ্জনী লীলায়িত করিয়া ফটোগ্রাফ খানি দেখাইলেন। নিয়ে এসেছিলেন প্রাণসুন্দরের বার্ত্তা! তাঁর স্পর্শে এই গৃহ পদ্মের মত তপোবন হ'য়ে ফুটে উঠেছে—আজ এখানে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি শুধু তাপস আর তাপসীর গুঞ্জন!" বলিতে বলিতে ঠান্‌দি শ্রান্ত হইয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইতেছিল; কিন্তু

অনুভূতিটা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে নিতান্ত খাপছাড়া বলিয়া মনে হইল, কাজেই সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারিলাম না, শুধু জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি

এখন কি করি স—"রাঙ্গাদি আমার চিবুকে হাত দিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "ডাকটি ফুটি ফুটি ক'রে ফুট্‌ছে না যে এখনো? কি কর্ব্বে আর? 'বহু দিন পরে বঁধুয়া আইলে' বোসো আধ আঁচরে বোসো—" ঠান্‌দি' পরণের জামদানী শাড়ীখানার আঁচল পাতিয়া কহিলেন, "ঠাট্টা নয়, সত্যি বোসো ভাই! আমার চোখে তুমিতো তেমনি ছোট্টই আছ—লজ্জা কি? যেমন ক'রে সেকালে ইস্কুল পালিয়ে জ্বরের অছিলায় আমার কোলে মাথা দিয়ে ঘুমুতে তেমনি ঘুমোও দেখি একটুখানি!" বলিয়া ঠান্‌দি' আমার মাথাটি তাঁহার বুকের দিকে টানিতে চেষ্টা করিতে মাথা সরাইয়া লইলাম। মাথার মাঝখানটায় বৎসরখানেক হইতে ডবল পয়সার মাপে একটা টাক পড়িয়াছিল, হঠাৎ মনে হইল ঠান্‌দিদি সেটি না দেখিলেই ভাল হয়।

ঠান্‌দি' হাসিয়া কহিলেন, "এ সরম কেন বন্ধু? আমরা তো সবাই তাপস। সুন্দরের, তরুণের তাপস। সরম এই তপস্যার সকলের চেয়ে বড় বাধা জানো না কি? দেখ ওই খাঁচার টিয়ার দিকে আর আঙ্গিনায় ওই শালিকবালাটি। দুইজনার দিকে চেয়ে দুইজনে তপস্যা কর্‌ছে! ওই পেঁপে গাছটি তার পাতার বাহু নাড়্‌ছে ওই সজ্‌নে বৌকে ডাক্‌ছে, কেউ কারো কাছে যেতে পার্চ্ছে না। পায়ে বাঁধা শিকড়ের শিকলি। মানুষের শিকলি এই সরম—এইটুকু কাট্‌তে হবে। এই শিকলি কাটাই আমাদের তপস্যা—ঘরের শিকলি, সমাজের শিকলি, সরমের শিকলি।" ক্ষুধার উপদ্রবে অথবা ভাবাবেগে জানি না শরীর ক্রমেই অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। এমন সময় টিয়া পাখীটি আঙ্গিনায় চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওরে সবুজ, ওরে আমার কাঁচা!" পরক্ষণেই বারান্দায় পদশব্দ শুনিয়া দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইলাম, স্বয়ং

যদু মাইতি উপস্থিত। তাহার সেকালের গোঁফদাড়ী নাই, মাথার খোঁচা খোঁচা চুলগুলি বাবরীতে পরিণত হইয়াছে, কাপড় পরিবার ভঙ্গীটিও দেখিলাম হরিকুমারের মতন। এটিও এই তপোবনের তাপস নাকি। পর মুহূর্ত্তেই সংশয় দূর হইল। ঠান্‌দিদি কহিলেন, "এস! এস! আজ আমাদের তপোবনে নতুন তাপস এসেছে।" মাইতি আমার চৌকীর কাছে আসিয়া যুক্ত করে কহিল, "স্বাগত, সুস্বাগত!" পরক্ষণেই আমাকে দেখিয়া সে হাতখানেক পিছাইয়া গিয়া কহিল, "আপনি!" শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ হইতেছিল তথাপি শিকার দেখিয়া উঠিয়া বসিলাম, ঠান্‌দি'র বক্তৃতা সুরু হইলে আর মাইতির সহিত কথাবার্ত্তায় সুবিধা হইবে না ভাবিয়া প্রথমেই কথা পাড়িলাম, "ভাল আছ তো মাষ্টার? সেই কথাটার জন্যে—"

মাইতি কহিল, "বলুন। সঙ্কোচ করবেন না। আমাদের তপোবনে সঙ্কোচ পাপ।" একবার রাঙ্গাদি'র দিকে চাহিলাম, দেখিলাম তিনি হরিকুমারের ফটোগ্রাফখানি সম্মুখে রাখিয়া চক্ষু মুদিয়া বসিয়া আছেন। বুঝিলাম ঠান্‌দি' ধ্যানস্থ, দলিলখানি বাহির করিয়া মৃদুস্বরে কহিলাম, "টাকা ক'টার হিসেবটা দেখে রেখেছ—"

মাইতি চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "টাকার হিসেব! টাকার হিসেব তো রাখিনি বন্ধু, এ বৎসরটা শুধু ফুলের হিসেব রেখেছি। বোশেখ থেকে সুরু ক'রে এই আশ্বিন, বলতে পারি যদি জান্‌তে চান— আমাদের এই তপোবনে কৃষ্ণচূড়ার কটি গুচ্ছ কটি বকুল, কটি অতসী ফুটেছে—" মাইতি বলিয়া চলিল। ইহার পর আর টাকার তাগিদ চলে না, কাজেই হাঁ করিয়া শুনিতে লাগিলাম।

হরিকুমারের প্রতি মনে বেশ একটা শ্রদ্ধার সঞ্চার হইল। এ-কি সেই মাইতি? তিনবার না কাশিয়া যে ব্যক্তি সে দিনও বাপের নাম উচ্চারণ করিতে পারিত না, আজ সে দিব্য সাধুভাষায় রাজ্যের ফুলের জন্মকোষ্ঠী কহিতেছে। ভাবিতে ভাবিতে আবার ভাবাবেশের উপক্রম হইল, এমন সময় টিয়ার চীৎকারে উঠিয়া বসিলাম। এবার যিনি উপস্থিত হইলেন তাঁহাকে দেখিয়াই চিনিলাম—শেখের বাজার গোরক্ষিণী সভার বিদ্যালঙ্কার মহাশয়। ঠান্‌দি' এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, বিদ্যালঙ্কারের সাড়া পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর আমাকে কহিলেন, "ইনি আমাদের এই তপোবনের ঋত্বিক। প্রাণগুরু এঁকে আমাদের এই হতভাগ্য পল্লীর নবজীবন-সঞ্চারের জন্য পাঠিয়েছেন—ধন্য করেছেন আমাদিকে।"

বিদ্যালঙ্কার একবার ব্যাকুল লোলুপদৃষ্টিতে রাঙ্গাদি'র পানে চাহিয়া কহিলেন, "ভরসা হইতেছে, অচিরাৎ এই জনপদ অস্মদ্‌জনের অনুগামী হইবে। অদ্য তাহার লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া আসিলাম, তৎকারণেই বিলম্ব ঘটিল। আমি মোড়ল-দীর্ঘিকার কূলে একটি বিরাট এরণ্ড-দ্রুম নিম্নে দণ্ডায়মান রহিয়া ম্লেচ্ছপল্লীর কুক্কুটগণের কলরব শ্রবণ করিতেছিলাম, এমন সময় দেখিলাম, একটি তরুণ ষণ্ড রজ্জুবন্ধন ছিন্ন করিয়া ধাবিত হইতেছে। তাহার পশ্চাতে মণ্ডলপুত্র একটি দণ্ড উত্তোলন করিয়া আসিতেছে। আমি তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলাম, "মা নিষাদ! হে বৎস! প্রহার করিও না, ষণ্ডসুন্দর তপস্যার বিঘ্ন করিও না—অপহ্নব ঘটিবে।" মণ্ডলতনয় দণ্ড অবনমিত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল, বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না; অনির্ব্বচনীয়

আনন্দ লাভ করিলাম। ভবিষ্যতে এই জনপদ তপোবনে পরিণত হইবে, কেহ কাহারও তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদন করিবে না এইরূপ অনুমান করিতেছি।" ঠান্‌দি' চক্ষু নিমীলিত করিয়া কহিলেন, "সে প্রাণগুরুর আশীর্ব্বাদ! তাঁরই কৃপায় শুষ্ক তরুর মরা ডালে ফুল ফুটেছে, মরা নদীতে বাণ ডেকেছে!"

বিদ্যালঙ্কারের কথা শুনিয়া কেমন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম, রাঙ্গাদি'র কথাগুলি বাঁশীর আওয়াজের মত কানে আসিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর দেখিলাম ঘরে কেহ নাই। বাহিরে অস্পষ্ট কলরব শোনা গেল। বাহির হইলাম। দেখিলাম কৃত্তিদা'র বাড়ীর দক্ষিণে বিস্তীর্ণ মাঠে উৎসবের কোলাহল উঠিয়াছে। মাঠের মাঝখানে একটি অতি দীর্ঘ বংশদণ্ড, তাহার মাথায় সবুজ নিশান, তাহাতে লাল কাগজের অক্ষরে লেখা "তরুণের তপস্যা।" 'বাস্তবিকা'র স্ত্রী ও পুরুষ সদস্যগণ সকলেই উপস্থিত দেখিলাম। নিশানের নীচে একটি মাটির ঢিবির উপর সবুজ গালিচা পাতা, তাহার উপর বসিয়া মুদিতনেত্র হরিকুমার। তাহার মাথায় সেকালের মতই একটি পাতার মুকুট, গলায় অতসী কুঁড়ির এক গাছি মালা। হরিকুমার ধ্যানস্থ। তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রাঙ্গাদিদি দুই বাহু আকাশে তুলিয়া নাচিতে নাচিতে গাহিতেছেন, "প্রাণগুরু, জয় প্রাণগুরু।" তাহার হাত দশেক পিছনে বসিয়া বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বিস্ফারিত নেত্রে রাঙ্গাদি'র দোলায়মান দেহযষ্টির দিকে চাহিয়া তপস্যা করিতেছেন। তপোবেগে তাঁহার সূক্ষ্ম শিখাটি মুহুর্মুহু আন্দোলিত হইতেছে। দূরে

দেখিলাম কৃত্তিদা'র বুড়া সরকার আমীর সেখের তৃতীয় পক্ষের 'নেকা'র বিবি ছমীরণ তাহার তিন পুত্রের হাত ধরিয়া দৌড়াইতেছে, আর কৃত্তিদা' মুক্তকচ্ছ হইয়া তাহাকে ধরিবার জন্য ছুটিতেছেন আর সাধিতেছেন, "ওগো আমার সোনামুগ! ওগো আমার পেঁয়াজ-কুচি।" ওদিকে যদু মাইতি হারু মাঝির বিধবা পত্নীর হাত ধরিয়া টানিতেছে, আর এক কোণে দাঁড়াইয়া গ্রামের পোষ্ট পিওন বুড়া বাসু মহান্তি যদু মাইতির স্ত্রী ক্ষেমঙ্করীর পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে। অন্য দিকে দেখিলাম শিথিল সেন আমাদের গলির মোড়ের পানওয়ালী যাদুমণির পায়ের কাছে নতজানু হইয়া গোলাপী কাগজে লেখা কি যেন একটা পড়িতেছেন, তাঁহার মুখ তপঃপ্রভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারই পাশে দাঁড়াইয়া চাঁপাতলার রঙ্গময়ী ধাত্রীর শাড়ীর প্রান্ত দাঁতে কাটিয়া বেতস ব্যানার্জ্জি শিশুর মত চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছেন। কাহারও কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। চারিদিকে শুধু ক্রন্দন, হা-হুতাশ আর ছুটাছুটি। সহসা নিজের দিকে লক্ষ্য পড়িল, দেখিলাম আমি শুদ্ধ তপস্যা করিতেছি। আমার সম্মুখে বসিয়া আমাদের সেই কাণী দুধওয়ালী পিয়ারী গোয়ালিনী; আর আমি তাহার পা দুইখানি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া কীর্ত্তন গাহিতেছি, 'দয়া কর—দয়া কর হে!' একটু দূরে দেখিলাম গৃহিণী আমার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন; দেখিতে দেখিতে তাঁহার হাসি ভেদ করিয়া দুই পাটি দাঁত বিদ্যুতের মত ঝলসিয়া উঠিল, তিনি একখানি আঁশবটি লইয়া ঝড়ের বেগে পিয়ারী গোয়ালিনীর নাসিকা লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিলেন।

আমি ধড় ফড় করিয়া আসন ছাড়িয়া উঠিয়া বসিলাম, দেখিলাম ঠানদিদির বিছানার উপর বসিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছি আর তিনি এক গ্লাস সরবৎ আমার মুখের কাছে ধরিয়া কহিতেছেন, "এইটুকু খেয়ে চট ক'রে স্নান সেরে এস, সাঁঝে আবার আমাদের উৎসব, গোছগাছ আছে।" আবার উৎসব! এক চুমুকে সরবৎটুকু নিঃশেষ করিয়া স্নানের অছিলায় একেবারে নদীর ঘাটে গিয়া নৌকা ধরিলাম।

কলিকাতায় যখন পৌছিলাম, বুকের কাঁপুনি তখনও থামে নাই। বাড়ীতে ঢুকিয়া একবার সভয়ে গৃহিণীর দিকে চাহিলাম। দেখিলাম তিনি পরম সুস্থ চিত্তে পিয়ারী গোয়ালিনীর সহিত খোস-গল্প জুড়িয়া দিয়াছেন। আমাকে দেখিয়া পিয়ারী কহিয়া উঠিল, "বাবুজী এসেছেন।" আমি আর তাহার দিকে চাহিতে পারিলাম না, কেমন একটু লজ্জা বোধ হইতে লাগিল, একেবারে ঘরে গিয়া ঢুকিলাম।

গৃহিণী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আদায় হ'ল টাকা?"

বিছানায় পাশ ফিরিয়া কহিলাম "সে আর আমার দ্বারা হবে না, পার তো নিজে গিয়ে আদায় ক'রে এসো।"

বলা বাহুল্য, গৃহিণী যদু মাইতির টাকা আজ পর্য্যন্ত আদায় ক৷রয়া উঠিতে পারেন নাই।

মুক্তিসেনা

মেয়েটির জন্য কিছু ভাল সুঁচের কাজের নমুনা সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা ছিল। সেই উদ্দেশ্য একজিবিসনে আসিয়া লেডিজ সেক্‌সনে তালকাণা হইয়া ঘুরিতেছিলাম।

"আপনি পিয়াসী কি?"

প্রশ্ন শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখি ভলান্টিয়ারের যোদ্ধৃবেশে শ্রীমান্ হরিকুমার! একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "হঠাৎ তুমি এখানে হরি?"

হরিকুমার পিছনের দিকে মিহি রকমের একটি দৃষ্টি হানিয়া কহিল; "এইতো স্থান! যথাস্থান। দেশের এই বিপদে রণস্থলে আমরা সবাই হাত ধরাধরি ক'রে না দাঁড়াই যদি আজ—থাক্ সে কথা হবে পরে। আপনি কি পিয়াসী? চা?"

মাঝে মাঝে হাই তুলিতেছিলাম, চা হইলে মন্দ হয় না। কহিলাম, "বেশ। কোথাও বসা যাক্।"

হরিকুমার আমার হাত ধরিয়া আনিয়া প্রকাণ্ড একটি গাছের ছায়ায় চেয়ারে বসাইয়া দিয়া কহিল, "বসুন আপনি, আস্‌ছি।"

একবার ভাল করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, শুধু আমি একা নহি আরও অনেকে চায়ের প্রত্যাশায় বসিয়া আছেন, দুই একজন যুবা মাড়োয়ারীকেও দেখিলাম। তিন চার মিনিটের মধ্যেই হরিকুমার ফিরিল। ট্রে'তে চায়ের কাপ সাজাইয়া জনকয়েক তরুণী আসিলেন। চট্‌ করিয়া একবার চাহিয়া লইলাম, তাঁহাদের আদ্যোপান্ত সবুজ ; দেখিয়া দেহটা কেমন ছম্‌ ছম্‌ করিয়া উঠিল। ভাবিলাম হরিকুমারের 'বাস্তবিকার' সদস্যগণ বুঝি চায়ের ষ্টল খুলিয়াছেন। পেয়ালায় চুমুক দিয়া কহিলাম, "দোকানে লাভ হচ্ছে কেমন হরি?" হরিকুমার কহিল, "টাকা পয়সার দিক দিয়ে কি হচ্ছে জানিনে। তবে বুকের তরফে মনের হিসাবের খাতায় একটা লাভের অঙ্ক জমা হচ্ছে বটে। এই নিতান্ত শুক্‌নো নিছক দোকান দারির মধ্যে একটুখানি পুলকের ছোঁওয়া হেথায় এলে বুকে লাগে। দোকনদারীটাই যে মানবজীবনের সারবস্তু নয় এখানে এসে বুঝ্‌তে পারে সবাই কিছু কিছু। ওই ক'জনা মাড়োয়ারী ভদ্রলোক, ওঁরা তো নিত্য আসেন, ওঁদের একজনা আবার চা খান না তবু পোয়ালা নিয়ে দাম চুকিয়ে চা-টুকুন তেমনি রেখে চলে যান। ওঁরা হুণ্ডীর দালাল, সুদবাট্টা নিয়ে কারবার—তবু কাজের ফাঁকে একবার ক'রে এসে ঘুরে যান আর নিয়ে যান প্রাণজগতের একটুখানি মলয়-পরশ। লাভ শুধু এইটুকু—আমাদের দিয়েই সুখ।"

ইতিমধ্যে পেয়ালা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল, একটি তরুণী আসিয়া

দাঁড়াইলেন। পকেট হইতে :একটি টাকা বাহির করিয়া দিয়া বসিয়া রহিলাম। হরিকুমার কহিল, "ওদিকে ছেলেরা দাঁড়িয়ে আছে, দেখুন, সঙ্কোচে আস্‌তে পাচ্ছে না। একটু আড়ালে যাই চলুন।"

"যাই চেঞ্জটা আসুক্!"

হরিকুমার কহিল, "কিসের চেঞ্জ!"

"টাকা একটা দিয়েছি, ফির্‌তি পরসা—"

আমার কথা শুনিয়া হরিকুমারের একটু করুণার উদ্রেক হইল মনে হইল, সে হাসিয়া কহিল, "চেঞ্জ তো পাবেন না। এঁরা যা নেন তা ফিরিয়ে দেন না।"

এ কথা যে কতবড় সত্য তাহা জানিতাম। ছাত্র-জীবনের একটা কথা মনে হইয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। আমাদের পাড়ায় শিবু বাঁড়ুয্যের দশ বৎসরের মেয়ে বগি ওরফে বগলামুখীকে অনেক কিছুই দিয়াছিলাম, হৃদয় দিয়াছিলাম কিনা এতদিন পরে মনে পড়িতেছে না। ছুটির সময় জলপানির জমানো টাক হইতে কত রকম তেল যে কিনিয়া লইয়া গিয়াছি। তাহার মাথার পিছনের একটা জায়গা কাকে ঠোক্‌রাইয়া দিয়াছিল, সেখানে চুল ছিল না, নিভৃতে ডাকিয়া নিজ হাতে সেখানে তেল মালিস করিয়া দিয়াছি। তাহার টাকে চুল তোলাই আমার দিবসের কর্ম্ম, নিশীথের স্বপ্ন, ছাত্রজীবনের সাধনা ছিল। কিন্তু সাধনা সফল হইবার পূর্ব্বেই সে আর একজনকে বিবাহ করিয়া জীবনের মত পর হইয়া গেল, কিছুই ফিরিয়া পাইলাম না। কেশ তৈলের গুটি দুই খালি বোতল ছাড়া। তাহার স্বামী কালি-ঘাটে আছে শুনিয়া গিন্নীকে লুকাইয়া সেদিন সেখানে গিয়াছিলাম;

কড়ানাড়ার শব্দ শুনিয়া বগি দোতালার জানালা খুলিয়া একবার দেখিল, তাহার পর ঝিকে ডাকিয়া কহিল, "বলে দে ঝি, বাবু বাড়ী নেই।" আহত হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। ভাবিতে ভাবিতে আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।

হরিকুমার কহিল, "বেদনা পেলেন কি?" অন্যপ্রকার বেদনার কথা দূরে থাক্ একটা টাকা ফস্ করিয়া পকেট হইতে বাহির হইয়া যাওয়াতে কিরকম একটা সূক্ষ্ম বেদনা অনুভব করিতেছিলাম, কহিলাম, "একটা টাকা অনর্থক—"

"অনর্থক! এখনো আপনি সেই পুরোণো মানুষটি—সেই জমা খরচের পুতুলটিই র'য়ে গেছেন—আশ্চর্য্য! জাতির মুক্তির জন্যে বলি দিতে হয় সব—আর একটি টাকা দিয়ে আপনি—আর কি বল্‌ব?'"

হরিকুমার আবার বসিয়া পড়িল।

স্বাধীনতার সহিত চায়ের দোকানের কোন সম্পর্ক আবিষ্কার করিতে না পারিয়া কহিলাম, "একটাকার পেয়ালা সবাই খেলে যদি স্বাধীনতা লাভ হয় তবে—" হরিকুমার কথা শেষ হইতে দিল না, কহিয়া উঠিল, "চায়ের দাম এ নয়! এ নয়! ভুল বুঝবেন না। এ তাঁদেরই দাম! যে মঙ্গল হস্ত এই সুধাপাত্র ভ'রে দিচ্ছে তারই মর্য্যাদা! আর এঁরা কে তা জানেন? জাতির মুক্তিসমরের রণশক্তি। আজও হয়তো এঁদের অনেকে আপনাকে লুকিয়ে চল্‌ছেন, নিজেদের স্বভাবসম্ভ্রমের নাগরজ্জু এঁদের অনেকের গতিকে বন্ধনে মন্থর করেছে

হয়তো; কিন্তু চিরদিন এ ভাব রইবে না। যে দিন এঁদের গতি মুক্ত হবে, নারীর সহজ স্বভাবের গ্রাস থেকে যেদিন এঁদের নারীত্ব পৃথক্ হবে—জাতির মুক্তি হবে সেদিন। সেদিন আসন্ন। জান্‌বেন আপনি, ইংরেজ যদি কাউকে ভয় করে তবে এঁদের। সেদিন আপনাদের হৌসের বড় সাহেব এসেছিলেন—তাঁকে চিন্‌তুম গেটের লাঠিসঙ্কুল ভলান্টিয়ারের অরণ্য তিনি নির্ভয়ে পার হ'য়ে এলেন কারো দিকে চাইলেন না, কিন্তু এখানে এসে এই সবুজের অনীকিনীর দিকে তিনি স্তম্ভিত হ'য়ে চেয়ে রইলেন। আমি একবার তাঁর দিকে চাইলুম তাঁর দৃষ্টিতে কি দারুণ শঙ্কার আভাস! বুঝলুম আমাদের বল কোথায়, বুঝ্‌লুম মুক্তি কোন্‌পথে, বুঝলুম ইংরেজের মারণাস্ত্র কি।

প্রথমে আমিও বুঝিনি, তাই আস্‌তে অস্বীকার করেছিলুম। শেষে বুঝলুম যখন, তখন বাস্তবিকার সদস্যদল নিঃশেষ এসে যোগ দিলুম এই মুক্তিরণে। আর শুধু বাস্তবিকা নয় আমার 'বেকার বান্ধব বোর্ডিং'-এর প্রত্যেকটি মানুষ এসে মুক্তিসৈনিকের বেশ গ্রহণ করেছেন! ভরসার কথা নয় কি?"

এই সময় একটি তরুণী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু চাই কি আর?"

শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হইয়া আসিল, মুখ নীচু করিয়া কহিলাম, "না।" তরুণী চলিয়া গেলেন। আমিও হরিকুমারকে হাত ধরিয়া বাহিরে আনিয়া কহিলাম, "তোমরাই দেশের ভরসা হরি। আমাদের দ্বারা আর কিছু হোল না!"

"দুঃখ কর্ব্বেন না। জাতির জন্যে ত্যাগস্বীকার কর্ব্বার ক্ষমতা সবার থাকে না। তবে আপনার কাজ আংশিক কর্ত্তে পারেন একজন—বৌদিদি। আমাদের আরও শক্তি চাই—তাঁকে দিতে পারেন ইচ্ছা হ'লে।"

তাড়াতাড়ি কহিলাম, "উঁহু! তা হবে না। তাঁর ষষ্ঠী পূজোর উপোস আছে, কি একটা চণ্ডীর ব্রত আছে। জাতির কাজে সে সব লোককে লাগিয়ে লাভ নেই।"

হরিকুমার প্রত্যুত্তরে কি বলিতে যাইতেছিল, ভয় পাইয়া কহিলাম, "কাল আবার আস্‌ছি হরি! আজ চলি।"

হরিকুমার হাত ছাড়িয়া দিয়া কহিল, "কাল আবার আস্‌ছেন তো?"

আবার কাল!

মুখে কহিলাম, "হুঁ, নিশ্চয়।"

বাহির হইয়া আসিলাম, মেয়েটির জন্য আর কিছু কেনা হইল না।

হরিকুমারের হরতাল

হরতালের দিন প্রাতে ঘুরিতে ঘুরিতে চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে আসিয়া পড়িয়াছিলাম; কাছেই যে হরিকুমারের বাসা তাহা স্মরণ ছিল না, একরূপ নিশ্চিন্ত হইয়াই ঘুরিতেছিলাম।

"দাঁড়িয়ে যাবেন একটুখানি!" উপরে চাহিয়া দেখি সবুজ রঙের গান্ধী টুপি মাথায় হরিকুমার গাড়ীবারান্দা হইতে লাল সাদা ও সবুজ তিন রঙা রুমাল নাড়িয়া আমাকে ডাকিতেছে; মুহূর্ত্তের জন্য একটু হৃৎকম্প হইল, কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসম্বরণ করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম। হরিকুমার নামিয়া আসিয়া একেবারে আমার হাত ধরিয়া অত্যন্ত করুণ-স্বরে কহিল, "আচমকা এ পথে যে! পথ ভুলে কি?" তাহাতে সন্দেহ ছিল না; কিন্তু এত বড় সত্যকথাটি হরিকুমারের মুখের উপর বলিতে বাধিয়া গেল। কহিলাম, "হরতাল দেখ্‌তে বেরিয়েছি।" হরিকুমার কহিল, "বিস্মিত কর্ল্লেন আমাকে! হরতাল দেখ্‌তে? হরতাল কি দেখবার বস্তু? অনুভব কর্ত্তে বেরিয়েছেন বলুন।" আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিলাম, "এই দোকান-পাট বন্ধ, এই সব দেখছি।"

হরিকুমার সহসা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া কহিল, "দোকান-পাট! শুধু দোকান-পাট! বাইরের এহ বেনেতির আসবাব গুলোই কি একমাত্র দেখবার বস্তু আজ? আমাদের মর্ম্মলক্ষ্মী যে তাঁর পুলক-বিপণি বন্ধ করেছেন দেখবেন না তা কি?" বুঝিলাম হরি-কুমারের হাতে পড়িলে ঘণ্টা তিনেকের পূর্ব্বে মুক্তি নাই, তথাপি তাহার মর্ম্মলক্ষ্মীর পুলক-বিপণিটি দেখিবার জন্য কেমন একটা দুর্জ্জয় লোভ হইল। ধীরে ধীরে কহিলাম, "চল। কিন্তু একটু সকাল সকাল ছুটি দিও হরি।"

হরিকুমার একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "সেই এক কথা! চিরদিন থেকে দেখে আস্‌ছি আমার সঙ্গ ব্যথিত করে আপনাকে—আস্‌তে না আস্‌তেই ফিরে যাওয়ার কথাটিই বলেন আগে, তবু নিতান্ত হৃদয়ের ক্ষুধায় ডেকে আনি—" একটু অনুতাপ হইল, বুঝিলাম কথাটি বলা সঙ্গত হয় নাই। হরিকুমার কহিল "হরতাল—কোনো আনন্দের আয়োজনই নেইত আজ, ছুটি হ'তে দেরী হবে না আর।" বলিতে বলিতে হরিকুমার বাসার দরজার কাছে আসিয়া পৌঁছিল। চাহিয়া দেখিলাম বাসাটির কিছু সংস্কার হইয়াছে, দরজার পাশে দেয়ালে একটি প্রকাণ্ড টীনের লাল সাইন বোর্ড আঁটা, তাহাতে সবুজ রং দিয়া ফার্সী অক্ষরের ভঙ্গীতে লেখা "বেকার-বান্ধব বোর্ডিং।" সেদিন একজিবিসনে হরিকুমারের মুখে এই রকম একটা নাম শুনিয়াছিলাম, তাড়াতাড়িতে অতটা খেয়াল করি নাই; কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এটা কি হরি?" "দেখতেই পাচ্ছেন তো। তাঁদের সকলের মিলন-ক্ষেত্র এই—যাঁরা কর্ম্মের দিক্ দিয়ে, মর্ম্মের দিক্ দিয়ে, স্বাধীনতার দিক্

দিয়ে, প্রণয়ের দিক্ দিয়ে বেকার। 'বাস্তবিকা' এঁদেরই—এঁদেরই কর্ম্মের মঞ্চ। শুনে খুসী হ'তে পারেন হয়তো যে এই হতভাগ্য দেশের বেকারদের বিচিত্র বেদনা দূর কর্ব্বার জন্য 'বাস্তবিকা' অনেক কিছুই করেছে—অনেক কিছু যা আপনার বড় বড় সভাসমিতি Institute করেনি।"

উৎফুল্ল হইয়া কহিলাম, "এ কথা তো বলনি! এ কাজে তো অনেক টাকার দরকার। চাঁদা তুলেছ বুঝি?"

হরিকুমার কহিল, "না, যাঁরা আসেন তাঁরা বাড়ী থেকে পাথেয় সঙ্গেই আনেন। যাক্—সে প্রসঙ্গ আর একদিনের। আজ আমাদের হরতাল, 'বাস্তবিকায়' ছোট্ট একটু অনুষ্ঠান, উঠুন।"

সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে লাগিলাম। সিঁড়ির দুইধারে কাগজের টুক্রায় বাঙ্গালায় লেখা "ফিরে যাও! ফিরে যাও!" মাঝে মাঝে ছোট ছোট কালো কাগজের নিশান। তেতলার সিঁড়ির মুখে দেখিলাম কালো কাপড়ে আপাদমস্তক আবৃত হরিকুমারের সেই ঝি মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া। সে আমাকে দেখিয়া আজ মুখ ফিরাইয়া লইল, আগেকার মত মৃদু হাসিয়া আর নমস্কার জানাইল না। "কেমন আছ ঝি?" জিজ্ঞাসা করিতেই ঝি কথা না কহিয়া ভয়ানক কাঁপিতে আরম্ভ করিল। আতঙ্কে হরিকুমারের দিকে চাহিলাম। হরি কহিল, "চেনেন তো এঁকে নিশ্চয়ই, ইনি আমাদের চিরন্তনী 'বাস্তবিকার' আজন্মের সঙ্গিনী, তার দুঃখ-সুখে আশাউৎসবে সবসময়ে। আজ ওঁর এই বেশ 'বাস্তবিকা'র অন্তরের বেশ, ওঁর এই কম্পন 'বাস্তবিকার' মর্ম্মলক্ষ্মীর আক্ষেপ।" বলিতে বলিতে হরিকুমার বাস্তবিকার সভাকক্ষে গিয়া ঢুকিয়া নতশিরে দাঁড়াইল,

আমিও ত্রস্তভাবে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, বাস্তবিকার পূর্ব্বের সজ্জা আজ নাই। ঘরখানির সর্ব্বাঙ্গ কালো কাগজ দিয়া মোড়া, মেঝেতে কালো রংয়ের প্রকাণ্ড একখানি সতরঞ্চি, তাহার উপরে হাস্নুহানা আর গোলাপের পাপড়ি ছড়ানো। জিজ্ঞাসা করিলাম, "সভা হ'য়ে গেছে বুঝি?" হরিকুমার কহিল, "না, হবে। ফুলের পাঁপড়ি দেখে ভাব্ছেন বুঝি! ফুল নেই দেশে আর অত্যাচারের ঝড়-ঝাপটায় সব গেছে ঝরে, আছে শুধু খোশবুহারা পাঁপড়ি তাদের। বস্তু দিয়ে দেশের মনের এই ছবি আঁকবার প্রয়াস পেয়েছি। দেখুন হোথায়।" দেখিলাম জানালার মুখে পায়ে দড়ি বাঁধা একটি মরা দাঁড়কাক অধোবদনে ঝুলিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "এটা কি?" হরিকুমার ম্লানমুখে বলিল, "কি ক'রে বোঝাব আপনাকে? আমাদের অবস্থাটি এই রকম নয় কি বলুন তো? এই বিহঙ্গজায়া আর্ত্তনাদ করছে কাল সারারাত। আজ সে রুদ্ধকণ্ঠ বাক্যহীন নিষ্প্রাণ। আর আমরা সুদীর্ঘ কাল ধরে আর্ত্তনাদ করেছি 'মুক্তি দাও! মুক্তি দাও!!' আজ সব চীৎকার সব আর্ত্তনাদ মৃত্যুর কলরবে ডুবে গেছে, আজ আমরাও রুদ্ধকণ্ঠ এই দাঁড়কাকটির মত।" হরিকুমারের চক্ষু সজল হইয়া আসিল। হরিকুমারের দুঃখে আমিও অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিলাম, এমন সময় পথে ধ্বনি শুনিলাম "ফিরে যাও, ফিরে যাও হে!" অনেকগুলি কণ্ঠের আওয়াজ, কিন্তু মিঠা লাগিল। রাত্রি দ্বিপ্রহর হইতে পথে গলির মোড়ে এই চীৎকার শুনিয়াছি; কিন্তু এখন যাহা শুনিলাম তাহাতে বৈচিত্র্য ছিল। এই এক কথাই উচ্চারিত হইতেছিল নানা রকম সুরে—কখনও খাদে কখনও চড়ায়। হরিকুমার

মাথা একটু নত করিয়া কহিল, "বাস্তবিকার অন্তরলক্ষ্মীরা আসছেন।" প্রশ্ন করিলাম, "এরকম বিচিত্র সুরে চীৎকার কচ্ছেন কেন?"

"এখনি বুঝবেন সে কথা। বোঝবার দরকার হ'য়েছে সবারই। দেশের বেদনার আর্ত্তনাদকে আমি একটা সুরের রূপ দিতে চাই। সুরই হচ্ছে প্রকাশের সার্থকতা তাতো জানেন। আজকার— এই হরতাল দেশমাতার মনের গোপন কোণের একখানি সঙ্গীত। এই ব্যথার সঙ্গীতকে রূপে জীবন্ত ক'রে দেখাতে চাই আমি।" এই সময় সিঁড়িতে পদধ্বনি শুনিলাম এবং পরমুহূর্ত্তেই সবুজ জমিনে লালপাড় বসানো শাড়ীপরা একদল বালিকা কিশোরী যুবতী ও প্রৌঢ়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন। হরিকুমার মিলিটারী কায়দায় Salute করিয়া ফাউণ্টেন পেনটি ব্যাণ্ডমাষ্টারের লাঠির ভঙ্গীতে মাথার উপর দিয়া ঘুরাইয়া লইল, সেই সঙ্গে একদল তরুণী সুর করিয়া গাহিয়া উঠিলেন, "ফিরে যাও! ফিরে যাও হে!"

তাহার পরেই আর একদল অপেক্ষাকৃত চড়াসুরে। ক্রমেই সুর চড়িতে লাগিল। আমি বিপন্ন হইয়া কানে আঙ্গুল দিলাম। নিতান্ত করুণ দৃষ্টিতে হরিকুমার আমার দিকে চাহিয়া কহিল, "ব্যথার মিউজিক সৈতে আপনারা পারেন না—এই যে অখ্যাতি সেটা মিথ্যে নয় মোটেই দেখছি।" অনুযোগ শুনিয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম; হরিকুমার কহিয়া চলিল, "হ্যাঁ, মোটেই মিথ্যে নয় এ কথা। জাতির অন্তর লোকের সংবাদ রাখতে চান না আপনারা। এই যে এরা উদারা মুদারা তারায়—সরিগমপধনি সাতটি সুরে একই বাণী উচ্চারণ ক'রে নগরের প্রতিফুটপাথ ধ্বনিত ক'রে ফিরছেন, একি জাতির

মর্ম্মলক্ষ্মীর অন্তর-বাণী নয়! এঁদের কণ্ঠধ্বনির সাথে সাথে তাঁর প্রাণ-তন্ত্রী কি সাতটি সুরে ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠছে না! আর এঁরা? আপনার চোখে বিহ্বল কৌতুক খেলে যাচ্ছে দেখছি—এঁরা কি এই হরতালকে ধন্য করেননি? বেদনার যাঁরা বিগ্রহ তাঁ'দিকে বাদ দিয়ে বেদনা প্রকাশের কোন্ আয়োজন সার্থক হবে বলুন তো? আজ দেশের মুক্তি-দেবীর দরবারে যে ভেট নিয়ে এসে হাজির হয়েছেন এঁরা, তার দাম কি কম কিছু? এঁদের আকাঙ্ক্ষা দেশের মুক্তি, সমাজের মুক্তির জন্য এঁদের যে ক্ষুধা তা পুরুষের চেয়ে কম কি? এঁদের মধ্যে সমাজের বিদ্রূপে যাঁরা ঘরণী অথবা জননী হ'তে বাধ্য হ'য়েছেন তাঁরাও আজ এই মুক্তি-রণে যোগ দিতে দ্বিধা করেননি মোটে। নমস্য এঁরা—শ্রদ্ধা করুন এঁদিকে।" হরিকুমার ভাবাবিষ্ট হইয়া চক্ষু মুদিয়া পরক্ষণেই গদগদ স্বরে কহিতে লাগিল, "এঁরা কি করেছেন, তা এঁরা জানেন না, কিন্তু জানি আমি। দেশের পলিটিকস যখন ঘুণে খাওয়া তাল তরুর মত শুকিয়ে উঠছিল তখন এঁরা এসে স্পর্শ করেছেন তাকে, আর সেই শুক্‌নো ঝুনো পলিটিক্সের গাছ মুঞ্জরিত হ'য়ে উঠেছে দখিণার স্পর্শে সজনে গাছের মত। এঁরা পালটিক্সকে সরস করেছেন—দেশের মুক্তি-সমরকে মনোরম করেছেন। বুকে হাত দিয়ে বলুন তো—আজ যে বুড়ো মানুষটি বালাপোষ ফেলে রেখে মেরুদণ্ড সোজা ক'রে যোদ্ধবেশে ছুটেছে সে কি এঁদেরই প্রেরণায় নয়? ওই যে খোকাটি চুষিকাঠি ফেলে লাঠি হাতে নিয়ে ছুটেছে, তার শক্তি কি এঁরা যোগান নি? হয়তো এ কথা মান্‌বেন না আপনারা, তবু জান্‌বেন আজকের হাজারো মিথ্যার মধ্যে এই কথাটুকুই সত্যি।

এই সত্য স্বীকার না করুন ক্ষতি নেই, দেশের রাষ্ট্র ও সমাজের অনাগত ইতিহাসে এই কথাটিই লেখা হবে রক্তের হরপে বড় করে! ভবিষ্যতের হাতেই সত্য বিচার হবে এঁদের আপনাদের হাতে নয়। যাক্—আজ বেদনার্ত্ত প্রভাত বেলায় আর কোনো আলোচনা কর্ত্তে চাইনে; (সম্মুখে চাহিয়া) সুর দিয়ে আপনারা আজ দেশের অন্তর-যন্ত্রণাকে মূর্ত্তিমতী করে তুলুন এই মিনতি জানাই আপনাদের কাছে।" হরিকুমার মাথার টুপি খুলিয়া আসন লইল। একটি তরুণী আসিয়া আমার হাতে একখানি ছাপা কাগজ দিয়া গেলেন। একবার চোখ বুলাইয়া দেখিলাম উপরে লেখা রহিয়াছে—"সাইমনী গজল। কাহারবা।" গানটি পড়িয়া শেষ করিবার পূর্ব্বেই সমবেত কণ্ঠে সঙ্গীত আরম্ভ হইল। গানের সুরমাধুর্য্যের পরিচয় দিতে পারিব না, তবে ছাপা গানটি তুলিয়া দিলাম ;—

সাইমনী গজল

(কাহারবা)

কেগো এলে খিড়কী দিয়ে বাংলা-বধূর দরদালানে ।
আমাদের—নিদ্‌মহলে নেইক 'সাকী' নেইক বাতি চেরাগ দানে ॥
হামেশা—দিল্ চিড়িয়ায় চরণ বেড়ি জিঁজীর বাজে ঝঞ্ঝনি ;
টাট্‌কা তাজা খুন সে বুকের ঐ ভেসে যায় ফুল-বাগানে ॥
দরদে—খোশবুহারা গোলাপ কাঁদে, হাস্নুহানা খায় খাবি,
মোরা হায়—ফেল্‌ছি শুধু আঁখের পানি —ওড়্‌না ঢেকে গুলবদনে ॥

গান শেষ হইলে হরিকুমার সজলনেত্রে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বেদনা বোধ কর্চ্ছেন না কি ?" আমি রুমালে মুখ মুছিয়া কহিলাম "অত্যন্ত। তোমার হরতালই সার্থক হরি, ভাববার বস্তু আছে। এখন তবে চলি, কি বল ?"

হরিকুমার সজল চক্ষে বলিল,—"আসুন তবে।" বাহির হইয়া আসিলাম।

ALL INDIA CAPTURIST ASSOCIATION

শ্রীমান্ হরিকুমার অকস্মাৎ রাজনৈতিক নেতা হইয়া উঠিবে, এরূপ আশঙ্কা স্বপ্নেও করি নাই। কিন্তু তাহাই সম্ভব হইয়াছে। আজ ডাকে All India Capturist Associationএর একখানি রিপোর্ট পাইলাম। সপ্তাহপূর্ব্বে উক্ত সভার বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছে, পুস্তিকায় সেই অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত কুমার রায়ের ভাষণ আদ্যোপান্ত ছাপা হইয়াছে। বন্ধুরা জানেন, রাজনীতির জ্ঞান আমার আদৌ নাই; যেহেতু দৈনিক সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন ও বাজার দর ছাড়া আর কিছু আমি পড়ি না। রবিবারে কোন পার্কের ধার দিয়াও যাই না এবং ইন্‌কামট্যাক্স হইতে আরম্ভ করিয়া রোডসেস্ পর্য্যন্ত সরকারের সর্ব্ববিধ নজরানা বিনা আপত্তিতে যোগাইয়া যাই। কাজেই, কোন রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত কোন সম্পর্ক না রাখিলেও হরিকুমারের বক্তৃতা দেখিয়া সেটি পড়িবার কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিলাম না। সভাপতির ভাষণ পড়িয়াই সভার উদ্দেশ্য পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম। আপনারা সভার বিবরণী-পুস্তিকা পাইয়াছেন কি না, জানি না; কাজেই

আপনাদের অবগতির জন্য বক্তৃতাটি নকল করিয়া পাঠাইলাম, ইতি।

শ্রীদিবাকর শর্ম্মা।

All India Capturist Asscn এর সভাপতি শ্রীযুত কুমার রায়ের অভিভাষণ

"বিজয়ী বন্ধুর দল! সভাপতিরূপে আপনারা আমাকে ডেকেছেন, এতে 'বাস্তবিকা'র প্রতি আপনাদের শ্রদ্ধা—তার কর্ম্মের প্রতি আপনাদের সহমর্ম্মিতা প্রকাশ পাচ্ছে। একটা কথা বুঝতে পার্চ্ছি যে 'বাস্তবিকার'ও কিছু দেবার আছে, দেশের রাজনীতির দরবারেও। সে দানটাও নিতান্ত তুচ্ছ হবে না। আপনাদের এই সংসদের দীর্ঘজীবন কামনা ক'রে 'বাস্তবিকার' সঙ্গে আপনাদের সাহচর্য্য কামনা ক'রে আমার বক্তব্য বল্‌ছি আমি।

Capturist Asscn-এর একটা বাঙ্গলা তর্জ্জমা করেছি আমি। আপনারা তা' মেনে নেবেন কি না জানিনে—Capturist Asscn কিনা রাহু-সংসদ। যে ক্ষুধা রাহুর বুকে বাসা বেঁধে আছে আমাদের বুকেও সেই ক্ষুধা—রাহুর মতন গ্রাস কর্ত্তে চাই, ক্যাপচার করতে চাই, বেমালুম আত্মস্থ করে নিতে চাই। বাস্তবিকা থেকে এ প্রয়াস এক ক্ষেত্রে আমরা করেছি—কর্চ্ছিও। বাংলার তরুণ মনকে ক্যাপচার করতে চেয়েছি আমাদের গান দিয়ে, কথা দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, ব্যথা দিয়ে, হৃদয়ের কাতরতা দিয়ে।

বলতে পারি আজ জোর ক'রে, তা'তে কতক সফলও হয়েছি আমরা। ঢাকা থেকে আরম্ভ করে কালনা কাটোয়া, হুগলি থেকে কৃষ্ণনগর, সর্ব্বত্র আজ আমরা তরুণ ও তরুণীদের মনের উপর সবুজ নিশান পুঁতেছি—সে আমাদের বিজয়-নিশান। দিকে দিকে এই নিশান আমাদের উড়বে। এমন দিন আসবে যে দিন আমরা বাংলার নিখিল মনকে ক্যাপচার কর্ব্ব—সে দিন সুদূর নয়। আজও যে দুই একটি সামন্ত রাজা বাংলার মনকে টুক্‌রো করে নিয়ে দখল করে বসে আছেন, তাঁরাও আসন্ন অনাগতে আমাদের সাম্রাজ্য-সভায় কর নিয়ে নতশিরে আসতে বাধ্য হবেন, এ আশাও দুরাশা নয়।

কিন্তু শুধু হৃদয় ক্যাপচার করে ক্ষান্ত থাকলে আমাদের চলবে না—যুগের অগ্রগতির সঙ্গে ছন্দ রেখে, তাল রেখে আমাদের চল্‌তে হবে। বস্তু-পৃথিবীকেও ক্যাপচার করতে হবে আমাদের। আমাদের Capturist Associationএর এই উদার সঙ্কল্পের সাধনপথে আমরা চলেছি। ক্যাপ্‌চার! ক্যাপ্‌চার!! আমাদের রাহুগ্রাস থেকে কিছু যেন মুক্ত না থাকে। বাংলার যা কিছু আছে—মিল, মিউনিসিপালিটি, বোর্ড, ইউনিভারসিটি, কাউন্সিল, লাইব্রেরী, আব্‌গারী দোকান পর্য্যন্ত ক্যাপচার কর্ত্তে হবে সব। দেশের লোক যেদিকে চাইবে সেইদিকেই যেন আমাদের উদ্যতদংষ্ট্রা দেখে শ্রদ্ধায় অবনতশির হয়। বর্ষের প্রতি-দিবসের অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাম্রাজ্য যেন বিস্তার লাভ করতে থাকে। স্কুল, কলেজ, হাঁসপাতাল, সরাইখানা, পাঠশালা, গোশালা, ধরমশালা, তীর্থমন্দির, রেল, জেল, তেলকল, ক্যাপচারের পক্ষে কিছু যেন অযোগ্য না মনে করি আমরা।

(প্রশ্ন—টাকা ?)

অভাব নেই, রাজা-মহারাজার সিন্দুক আছে,—দেশপ্রেমিকা বান্ধবীদের অঙ্গের আভরণ আছে—মাড়োয়ারীর গদী আছে,—চামড়া-ওয়ালার তহবিল আছে,—কণ্ট্রাক্‌টারের বিল আছে—ক্যাপচার কর্ব্ব। অর্থের জন্যে চিন্তা করিনে মোটে আমি। জানি আমি—স্বদেশপ্রেমের উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা-বন্যার স্রোতে নগরীর ধনবতীর মণিমালা থেকে আরম্ভ করে পল্লীর কৃষকবধূর শস্যকণা পর্য্যন্ত ভেসে আসে। শুধু কুড়িয়ে নেওয়া—শুধু তাঁদের পায়ের কাছে আমাদের আঁচল বিছিয়ে দেওয়ার অপেক্ষামাত্র। ক্যাপ্‌চার করবার প্রবৃত্তি যদি আমাদের সত্য হয়, জাগ্রত হয়—তবে কিছুতেই বাধা পাব না আপনারা ঠিক জানবেন।

(উপায় কি ?)

উপায় আছে। বাক্যের দ্বারা, কর্ম্মের দ্বারা ক্যাপ্ চার করতে হবে—যদি ছলনার সাহায্যও নিতে হয়, তবে যেন আমরা বিনা দ্বিধায় তাহা গ্রহণ করি। এই অনন্ত ছলনাময়ী মাতা বসুমতীর বুকে বসে ছলনাকে যেন ঘৃণা করিনে—ছলনা তো সত্যেরই অন্য দিক্, বন্ধু সব! আমাদের মহান্ উদ্দেশ্যকে যারা হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে না পেরে, সভাসমিতিতে অর্থহীন চীৎকার করেন, তাঁদিকে যেন আমরা অনর্থক কথা বলার হাত থেকে রেহাই দিই—আমাদের সমবেত কণ্ঠরবে যেন তাঁদের কথা ডুবে যায়, আমাদের ধিক্কার-ধ্বনিতে যেন তাঁদের প্রতি বাক্য বাধা পায়—পথে-ঘাটে তাঁদের নির্ভয়ে বিচরণ করবার

অধিকারটুকুকেও যেন আমরা ক্যাপ্ চার করতে পারি। আমাদের অমোঘ বাক্যশেলে তাঁদের পিতৃপুরুষগণ পর্য্যন্ত যেন বিদ্ধ হ'য়ে ব্যথিত পুলকে আমাদের এই জয়যাত্রার প্রতি চেয়ে থাকেন। আমাদের এই অহিংস বিজয়াভিযান মৃত্যুলোকেরও অতিথিদের শ্রদ্ধা উৎপাদন কর্ত্তে পারে যেন!

(করতালি!)

বন্ধুগণ! এইবার বিদায় নেব। যে বৎসরটি সম্প্রতি অতীতে মিলিয়ে গেছে, তাকে আমাদের কর্ম্মের দ্বারা কতটুকু অর্চ্চিত কর্ত্তে পেরেছি তা আপনারা সভার সম্পাদকের ভাষণে শুনেছেন। গুটিকয়েক স্কুল কলেজ, গুটিকয়েক চটকল এবার আমরা ক্যাপচার করেছি। মুসলমান নামে এই দেশে যে একটি সম্প্রদায় আছে, তাঁদের জনকয়েক নায়ককে ক্যাপচার করেছি। কি মূল্যে করেছি, তা অবশ্য বলবার সময় এ নয়। দেবতাখ্য শিলাখণ্ডগুলি অথবা চতুষ্পদ জীববিশেষের জীবনের বিনিময়ে, কিংবা উপেক্ষিতা জনকয়েক নারীর অশ্রুর বিনিময়েই হোক্, তাতে কিছু যায় আসে না। মনের মূল্য—কলিজার দাম বস্তু দিয়ে কে নির্ণয় কর্ব্বে? তবু দেশের আর এক সম্প্রদায়ের কেউ কেউ এই অপার্থিব সম্পদের মূল্য অধিক হয়েছে ব'লে চীৎকার করছেন। কিন্তু সে চীৎকারে যেন আমরা আমাদের কর্ত্তব্য ভুলে না যাই। কারণ এ চীৎকার চিরকাল তারা কর্ত্তে পার্বে না, কণ্ঠ তাদের অবশ হ'য়ে আস্‌বেই—তাদের চীৎকার কর্ব্বার ক্ষমতাটুকু

পর্য্যন্ত আমরা ক্যাপচার কর্ব্বো। তার জন্যও আমাদের প্রয়াস চলছে। অদূর ভবিষ্যতে সে প্রয়াস জয়যুক্ত হবে, আশা রাখুন।

আজ আমি বিদায় নিই। আগামী বর্ষে এই সভার মঞ্চ থেকে আমরা যেন বজ্র-গর্জ্জনে জগৎকে জানাতে পারি যে লক্ষ্যে পৌঁছেচি আমরা, দেশের চিত্ত-বিত্তকে আমরা করগত করেছি, প্রভুত্বকে মুষ্টিগত করেছি, দেশের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সর্ব্ব বস্তুকে ক্যাপচার করেছি, গ্রাস করেছি, অধিকার করেছি, একমাত্র স্বাধীনতা ছাড়া। বিদায়!"

(করতালি!)

ইহার পর গুটি কয়েক প্রস্তাব আছে; বাহুল্য বোধে সে গুলির উল্লেখ করিলাম না। ইতি—

শ্রাদ্ধ-বাসর

আজকাল সন্ধ্যা বেলায় হাতে বিশেষ কোন কাজ থাকে না, ঘুরিয়া বেড়াই। শ্রীমান্ হরিকুমার রাজ-নৈতিক নেতা হইবার পর হইতে "বাস্তবিকা"র পথ চলা এক রকম বন্ধ করিয়াছি। প্রয়োজন হইলে লোক পাঠাইয়া শ্রীমানের খবর লইয়া থাকি, কিন্তু সে দিন নিজেই যাইতে হইল, প্রাতঃকালে সহসা 'আহত কুমারের' আমন্ত্রণ লিপি পাইলাম—"ঝরা পাতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে নব কিশলয়েরা অশ্রু ফেল্‌বেন—আস্‌তে হবে আজ মৌন সন্ধ্যায় বেদনার উপচার নিয়ে।" বেদনার উপচার গৃহিণী যোগাইতে পারিবেন কিনা জিজ্ঞাসা করিতে ভিতরে গেলাম। তিনি চিঠি পড়িয়া কহিলেন, "স্যাকরার দোকানের হিসেবটা একবার দেখে এস তাহ'লেই—।" বাধা দিয়া কহিলাম, "এ সব বিষয় নিয়ে পরিহাস কর্ত্তে নেই, হয়তো কেউ মরেছে তাই হরি খবর দিয়েছে, যাওয়া যাবে কিন্তু বেদনার উপচারটা—যা হোক্!" বলিয়া মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বাহিরে আসিয়া খবরের কাগজের পুরাতন ফাইল ঘাঁটিতে বসিলাম। অনেকগুলি শোকসভার বিবরণ পাঠ করিয়া

প্রস্তুত হইলাম; হয়তো বক্তৃতা করিতে হইবে পত্র পড়িয়া এইরকম একটি আশঙ্কা জন্মিয়াছিল।

সন্ধ্যায় যথাকালে "বাস্তবিকা"র সভাকক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ছোট ঘরখানিতে আদৌ স্থান ছিল না। আমাকে দেখিয়া হরিকুমার চিরাচরিত প্রথায় নমস্কার করিল। তাহার বেশ মলিন, কেশ রুক্ষ। মনে একটু শঙ্কা হইল, জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি হরি? কোনো দুঃসংবাদ"—হরিকুমার আমার কথা সমাপ্ত হইতে দিল না, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিয়া উঠিল, "জগতের সমস্ত বেদনা আজ আমরা কটি প্রাণী নিয়েছি ভাগ ক'রে। একজন চ'লে গিয়েছেন, আমাদের মনের অঞ্চলে তাঁর বিরহের আগুন লাগিয়ে—" হরিকুমারের ভূমিকা অনেকক্ষণ চলিবে ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তিনি কে হরি?"

"রঘুনাথ মাইতি।"

"রঘুনাথ মাইতি! কি হ'য়েছিল তাঁর? কালও যেন তাঁকে কালী-ঘাটে দেখলাম!"

হরিকুমার চুলের মধ্যে আঙ্গুল চালাইয়া চুলগুলি আরও আলু-থালু করিয়া কহিল, "কি হ'য়েছিল তা শুন্বেন, চলুন মঞ্চে।"

ঘরের কোণে একখানি তক্তপোষের উপর কালো চাদর পাতিয়া মঞ্চ প্রস্তুত করা হইয়াছিল; সেখানে গিয়া বসিলাম। "বাস্তবিকা"র কুমারী সদস্যগণ কর্তৃক বিরহসঙ্গীত গীত হইবার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। হরিকুমার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া গদগদ স্বরে কহিল, "বন্ধুরা সব! যাঁ'কে হারিয়েছি, যাঁ'কে আমাদের মধ্যে ফিরে পাবো না আর সেই চ'লে যাওয়া সথাটির জন্যে যে বেদনা উদ্বেলিত হ'য়ে

উঠেছে আমাদের প্রাণে—সেই সেই বেদনার অর্ঘ্যথালি সাজিয়ে আজ এসেছি স্মৃতির দেউলে পুজো দিতে। আমাদের নারীবন্ধুরা বিরহসঙ্গীতে "বাস্তবিকা"র তরফ থেকে তার মনের কথাটি বলেছেন। 'শেখের বাজার গোরক্ষিণী সংসদে'র পক্ষ থেকে শ্রীযুত বেচারাম বিদ্যালঙ্কার শ্রদ্ধা নিবেদন কর্ব্বেন, আপনারা অবহিত হোন্।" শ্রীযুত বেচারাম বিদ্যালঙ্কার মহাশয় মঞ্চে উঠিলেন। বয়স প্রায় পঁচাত্তর, মাথায় চুল নাই, টাকের পশ্চাতে একটি সূক্ষ্ম শিখা আছে ললাটে হরিচন্দনের মিহি তিলক, পরণে কালো পাড় ঢাকাই ধুতি। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় মুখ ফিরাইয়া এক টিপ নস্য লইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "সমাগতা তরুণী ও উপস্থিত তরুণের দল! বঙ্গাকাশ হইতে নক্ষত্রপাত হইয়াছে! 'শেখের বাজার গোরক্ষিণী সভা'র সভাপতি শ্রীযুত রঘুনাথ মাইতি অকস্মাৎ আমাদিগের মায়া মমতা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন তাহা সেই অন্তর্য্যামী ত্রিলোকেশ ব্যতীত কেহই কহিতে পারেন না। তৎবিরহে গোকুল তৃণভোজন করিতেছে না। নন্দসূনু বিহনে ব্রজধামের যে প্রকার অবস্থান্তর ঘটিয়াছিল 'শেখের বাজার গোরক্ষিণী সভা'র তদ্রূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। গো-কুল মানব-ভাষায় কথা কহিতে পারে না হেতু আমি তাহাদিগের পক্ষ হইতে শোক-প্রকাশার্থ এই সভায় সমাগত হইয়াছি। সভার কার্য্য সুপরিচালিত করিয়া আপনারা উক্ত মহাত্মার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবেন, আশা করি। অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।" বিদ্যালঙ্কার মহাশয় আসন গ্রহণ করিলেন। হরিকুমার দ্বিতীয় বক্তাকে আহ্বান করিয়া কহিল, " 'দ্বিজেন্দ্র-নাট্যপরিষদে'র সম্পাদক শ্রীযুত

অকিঞ্চন আইচ।” আইচ মহাশয়কে একবার দেখিয়া লইলাম। বয়স চল্লিশ ও পঞ্চাশের মাঝামাঝি। পাঞ্জাবীর আস্তিন গুটাইয়া ও বাবরী চুল ঝাঁকাইয়া অকিঞ্চন বাবু মঞ্চে উপস্থিত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, “চ’লে গেল! এই গাঢ় নীল আকাশ থেকে খসে গেল আজ দ্বাদশসূর্য্য—রঘুনাথ মাইতি। যে রঘুনাথ একদিন দ্বিজেন্দ্র-নাট্য-পরিষদের প্রথম অভিনয়-রজনীতে অভিনয়-তাণ্ডবে জগৎকে চমৎকৃত করেছিলেন কোথায় আজ সে রঘুনাথ? কাঁদো অভাগিনী “বাস্তবিকা” কাঁদো আজ! বীণার মূর্চ্ছনার মত, মলয়ের প্লাবনের মত যে এসেছিল সে চ’লে গিয়েছে। আজ সমস্ত আকাশ বাতাস মেঘ আর বিদ্যুৎ, রেল আর ট্রাম এক অভিনব শোক-ঐক্যতান রচনা ক’রে চলেছে শুনতে পাচ্ছ? যদি শুনতে পাও তবে মুখ ঢাকো, ঢাকো মুখ! একটা স্ফুলিঙ্গ আজ দাউ দাউ ক’রে জ্বলে উঠে নিভে গেল, একটা গরিমা ম্লান হ’য়ে গেল, একটা ধূমকেতুর পুচ্ছ আজ সহসা—” এই পর্য্যন্ত বলিয়াই অকিঞ্চন বাবুর বাক্‌রোধ হইল। সমাগত শ্রোতৃগণ সমস্বরে কহিয়া উঠিলেন, “ব্যথা! ব্যথা!!”

হরিকুমার তৃতীয় বক্তাকে আহ্বান করিল, “বেতস ব্যানার্জ্জি ‘যুগল’ পত্রিকার সম্পাদক।” অপাঙ্গে একবার বক্তাকে দেখিয়া লইলাম। দেহখানি বেতসের মতই লীলায়িত, বাহুল্যের মধ্যে তাহার উপর একখানি সবুজ রেশমী চাদর। বেতস ব্যানার্জ্জি “বাস্তবিকা”র কুমারী সদস্যাদিগকে নমস্কার করিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন—

“এই শোক-সভাকে রোশনাই করেছেন আপনারা, ধন্যবাদ জানাচ্ছি সে জন্য। যাঁর জন্যে চোখের জল ফেল্‌তে আজ আসা, তাঁকে সব্বাই

আপনারা জান্‌তেন। অকস্মাৎ তাঁর পটলতোলাতে "বাস্তবিকার" সঙ্গে আমার নিজেরও একটা লোকসান হোল। তাঁর সঙ্গে আমার 'যুগলের' মাথামাথি রকমের একটা সম্পর্ক ছিল—তাঁর Hardwareএর দোকানের বিজ্ঞাপন আমি কি মাসে বরাবর পেইছি। আর পাব কি না জানিনে। কারণ, শুন্‌ছি তিনি দোকান শ্রীরাম আগরওয়ালাকে বেচে গেছেন। সে যাহোক্, সবার সাথে 'যুগলের' তরফ থেকে আমিও তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যাচ্ছি।"

বেতস ব্যানার্জ্জি আসন লইলেন। হরিকুমারের আহ্বানে পরবর্ত্তী বক্তা উঠিয়া আসিলেন—শ্রীযুত সুনিবিড় সেন—'শ্যামল সঙ্ঘে'র অন্যতম সম্পাদক—বছর পঁচিশেক বয়স; আজানুলম্বিত পাৎলা খাদির চুড়ীদার পাঞ্জাবী, পায়ে নাগরা; তিনি কহিলেন, "ছোট্ট দুটি কথা আমার বল্‌বার, হঠাৎ শিঙে ফুঁকে রঘুনাথ বাবু শ্যামল-সঙ্ঘকে অনাথ ক'রে গেছেন একেবারে। আমাদের সঙ্ঘের তিনি ছিলেন অর্থনায়ক। সে-কালে রাজারা খেতে পরতে দিতেন, আর কবিরা ছন্দ লিখ্‌তেন। এ কথা স্বীকার কর্ত্তে দ্বিধা নেই আমার, যে তাঁর আনুকূল্যেই শ্যামল-সঙ্ঘ এতখানি কাজ কর্ত্তে পেরেছে। এখন কি হবে তা শুধু হৃদয়-দেবতাই বল্‌তে পারেন, তবে আমি আশা করি রঘুনাথের ঠাঁই নেবার জন্যে উপস্থিত বন্ধুদের মধ্যে কেউ এগিয়ে আস্‌বেন, তা হ'লেই এই সভা সার্থক হবে।"

সুনিবিড়বাবু আসন গ্রহণ করিলে হরিকুমার কহিল, "'বাস্তবিকার' তরুণতম সদস্য শ্রীযুত নিমীলিত নন্দী।" আলুথালু বেশকে যথাসম্ভব গুছাইয়া ও স্প্রিংয়ের চসমা নাকের ডগায় ভাল করিয়া আঁটিতে আঁটিতে শ্রীযুত নিমীলিত নন্দী—আসিয়া মঞ্চে উঠিলেন। বয়স প্রায় সতেরো

কেবল গোঁফের রেখা দেখা দিয়াছে। নিমীলিত নেত্রে সকলের দিকে চাহিয়া নিমীলিত-বাবু বলিলেন,—"সবাই যা বলেছেন আমিও তাই বল্‌ব। এছাড়া বেশী বল্‌বার নেই তো কিছু। রঘুনাথের আচমকা টেঁসে যাবার খবর কলেজে পেয়ে মনটি আমার এক্কেবারে থেঁৎলে গ্যালো। অনেক কষ্টে সাম্‌লে গেলুম। ভাবলুম মনে, সবুজ পাতাগুলো হল্‌দে হ'য়ে যায় আর রঘুনাথ তো মানুষ! এই ভেবে যেন আমরা মনকে প্রবোধ দিতে পারি। যদিও প্রবোধ এর নেই।"

(করতালি)

নিমীলিত নন্দী আসন গ্রহণ করিলেন, হরিকুমার উঠিয়া কহিল,—"যাঁদের সঙ্গে শ্রীযুত রঘুনাথের পরিচয় ছিল তাঁরা সবাই তাঁরা কথা বলেছেন। একটুখানি তাঁদের সুরের সঙ্গে যদি আমি সুর না মেলাই তবে কর্ত্তব্যে আমার ত্রুটি থেকে যাবে হয়তো। আপনারা শুনে থাক্‌বেন, রঘুনাথ ছিলেন সর্ব্বময়। 'বাস্তবিকার' মর্ম্মকোষের তিনি ছিলেন সৃজন-ডিম্ব, শেখের বাজার গোরক্ষিণী সভার তিনি ছিলেন রাখাল, শ্যামলসঙ্ঘের তিনি ছিলেন বনস্পতি; 'যুগল'কে তিনি আগলে ছিলেন দুটি স্নেহবাহুর বন্ধন দিয়ে। আজ নেই তিনি। সে স্নেহবাহুর বন্ধন আজ শিথিল, বনস্পতি আজ দমকা ঝড়ে ধূলোয় লুটোচ্ছে, সে সৃজন-ডিম্ব ফেটে গেছে আজ, রাখালের হাতের পাঁচনী আজ খসেছে। সব্বাইকে ত্যাগ করেছেন তিনি। তবু তিনি ছিলেন—তাই আজ তাঁর শ্রাদ্ধ-বাসরে"—সহসা শ্রোতৃদলের পশ্চাৎ হইতে গর্জ্জন করিতে করিতে বিশালকায় একটি ভদ্রলোক বাহির হইয়া আসিলেন। চিনিলাম রঘুনাথ মাইতি স্বয়ং! কি করিব ভাবিতেছি এমন সময় রঘুনাথ চীৎকার

করিয়া উঠিলেন; "খবর্দ্দার! শ্রাদ্ধের কথা মুখে আন্‌লে গাল ভেঙ্গে দেব! জলজ্যান্ত মানুষের শ্রাদ্ধ করাচ্ছেন, বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে কিন্তু!" ব্যাপার কিছু বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু উপস্থিত বক্তাদের কাহারও ভাবান্তর উপস্থিত হইল না। হরিকুমার নিতান্ত সপ্রতিভভাবে কহিল, "আপনি ক্ষান্ত হোন্! কিছু বল্‌বার অধিকার আর নেই আপনার! আজ আপনি সে রঘুনাথ তো নন—(কঙ্কাল! কঙ্কাল!!) তাঁর কঙ্কাল মাত্র। ম'রে যাওয়াকেই আমরা মৃত্যু বলিনে তাতো জানেন। গাছ তাজা থাকলেও যখন তার সবুজ পাতা যায় ঝ'রে তখন আমরা বলি তার মৃত্যু হ'য়েছে। যে লোকে আমরা বাস করি সে লোকের এই হচ্ছে আচার। সেই আচারের হিসাবে মরেছেন আপনি, সেই হিসাবেই শ্রাদ্ধ কর্‌ছি আমরা আপনার।" রঘুনাথ মাইতি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "অলুক্ষণে কথা বারবার বল্‌বেন না! ভাল হবে না বল্‌ছি।" কথা শুনিয়া বুঝিলাম এ লোকটি তরুণ নয়। হরিকুমার মুদিত নেত্রে কহিল, "কি কর্ব্ব উপায় নেই, মৃত্যু আপনার হ'য়েছে। কাল আপনার মৃত্যুসংবাদ আমরা পেয়েছি। সে মৃত্যুবার্ত্তা আপনি নিজে লিখে দিয়েছেন। (পত্র বাহির করিয়া) এই আপনার মৃত্যু-লিপি। আপনি 'বাস্তবিকা'র সংশ্রব ছেড়েছেন—আমাদের কাছে আজ আপনি ঝরা পাতা—একটি ছোট্ট ঝরা পাতা শুধু-আর কিছু নয়—তবু আপনার ঝ'রে যাওয়াতে যতটুকু বেদনা 'বাস্তবিকার' শাখায় লেগেছে তারই জন্যেএই অশ্রুর শিশির ফেল্‌ছি আমরা। আপনি স্বীকার না কর্ত্তে পারেন কিন্তু তবু আপনি মরেছেন এ কথাতো মিথ্যা নয়।" হরিকুমার বসিতে না

বসিতেই রঘুনাথ মাইতি ঘুসি উঁচাইয়া একটি দুর্ব্বোধ্য চীৎকার করিয়া উঠিলেন। অকিঞ্চন আইচ তাঁহার উপর এক মাত্রা চড়াইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "স্তব্ধ হোন! আপনার কাকুতি শোন্‌বার সময় এ নয়। গোরক্ষিণী সভা থেকে আরম্ভ ক'রে দ্বিজেন্দ্র-নাট্য-পরিষৎ আজ যে শোক-স্বপ্নে বিভোর, সে স্বপ্ন ভেঙ্গে দেবার অধিকার নেই আপনার! অন্তর্হিত হোন্! আপনি কি করেছেন তা আপনি জানেন না!" রক্তচক্ষু রঘুনাথ মাইতি এই কথা শুনিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "কি করেছি আমি! কেল্লার কশাইদের কাছে গরু বেচতে দিইনি তাই বুঝি বিদ্যালঙ্কার আমার শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়াতে এসেছেন! আর ওই 'যুগল' কাগজ থেকে এক বছরের আগাম টাকা চেয়েছিলেন বিজ্ঞাপনের—তা দিইনি তাই বেতস বাবু হ'য়েছেন খাপ্পা। আর তোমরা সব ভদ্রঘরের বৌ-ঝি জুটিয়ে নাচগানের জল্‌সা করবে আর আমি দেব তার টাকা! মা-বোনের নাচ দেখব, কেমন?" রঘুনাথ মাইতির আর কথা জুটিল না, গোঁ গোঁ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার কথাগুলি শুনিয়া আমি একেবারে কল্পনার রাজ্য ছাড়িয়া বাস্তবে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, মাইতির মৃত্যুর কারণও মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিলাম। একটা কিছু বলিব ভাবিতেছি এমন সময় হরিকুমার উঠিয়া রঘুনাথ মাইতিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "আর কিছু বল্‌বার প্রয়োজন নেই আপনার—আপনার বাণী অকথিত হ'য়ে থাক্! কারো কোনো ক্ষতি হবে না তাতে, আপনারও নয়। যাঁকে আজ আপনার অশরীরী বাণীর বাণে আপনি বিঁধলেন সে বিদ্যালঙ্কার আজ আমাদের স্বজন। তাঁর জীবন-নিশার শেষ যামের সঙ্গীত শেষ হ'য়েছে, তাঁর

তৃতীয় পক্ষের সঙ্গিনী জীর্ণ দেহ থেকে মুক্তিলাভ করেছেন। বিদ্যালঙ্কার আজ তরুণ, আজ তিনি 'বাস্তবিকা'র অঙ্গের একটি নব কিশলয়ের মত উদ্গত হ'য়েছেন। আজ তিনি সব নিন্দার অতীত, তাঁকে কিছু বল্‌বার অধিকার ঝরাপাতার নেই। আমারও আপনাকে কিছু বলবার ছিল না ; কারণ আমার বাণী বুঝবেন না আপনি আর। তবু সেই জলসার কথায় একটা ছোট্ট কথা এল মনে। মা-বোনের নাচ বলেছেন কাকে ? 'বাস্তবিকা'র রস পিয়ে চিত্ত আপনার তিল-মাত্রও সঞ্জীবিত কি হয়নি ? অদ্ভুত ! মা আর বোন ! নিখিলের রস-সাগরের আমরা সবাই তরঙ্গ নই কি ? তরঙ্গের গায়ে মা আর বোনের নামের লেবেল এঁটে দিলে কি তা থাকে ? কেন এ ব্যর্থ প্রয়াস তবে ? কিন্তু যাক্‌ বলবার কিছু নেই আপনাকে আর। আপনি যে লোকের অধিবাসী আজ সেখানে জীবনের কোন বাণী পৌছবে না, জানি তা। 'বাস্তবিকা'র অঙ্গ থেকে ঝ'রে গিয়েছেন আপনি—আমরা অশৌচ গ্রহণ করেছি—আপনি লোকান্তর থেকে দেখে তৃপ্ত হোন্।" রঘুনাথ মাইতি কিছু না বলিতেই বিদ্যালঙ্কার মহাশয় কহিয়া উঠিলেন, "আপনার আত্মার সদ্গতি হোক্। কল্যাণ হোক্। ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে।" বাস্তবিকার কুমারী সদস্যগণ এই সময় কহিয়া উঠিলেন, "ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু।"

বিব্রত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিলাম এমন সময় এক পার্টি চীনে বাড়ীর নূতন পাম্প্‌সু বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের গালে আসিয়া লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথ মাইতি চীৎকার করিয়া কহিলেন, "এই দক্ষিণান্ত হ'ল।"

বিদ্যালঙ্কার মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, আরও দুই পাটি জুতা মঞ্চে আসিয়া পড়িল। মুহূর্ত্ত মধ্যে শ্রাদ্ধ-সভা যুদ্ধ-সভায় পরিণত হইল। আমি পিছনের দরজা দিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিলাম, সিঁড়িতে দেখিলাম লোহাপটির জন কয়েক দালাল লোহার ডাণ্ডা হাতে উপরে উঠিতেছেন। ইচ্ছা থাকিলেও আর মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা করিবার সাহস ছিল না; নামিয়া একেবারে সদর রাস্তায় ফুটপাথে গিয়া দাঁড়াইলাম। ইহার পরে কি ঘটিয়াছে শুনি নাই। 'বাস্তবিকা'র আগামী সংখ্যায় বিস্তৃত রিপোর্ট বাহির হইলে 'শনিবারের চিঠি সম্পাদক' মহাশয়কে পাঠাইয়া দিব মনস্থ করিয়াছি।

চারণ

(ঋতু পত্রিকা 'বাস্তবিকা' হইতে উদ্ধৃত।)

সে ছিল বীর, সে ছিল আমাদের চারণ।

লড়াইয়ের নেশায় মশগুল সে সাতটি বছর ঘর ছাড়া। বিবাহের নারীটিকে ব'লে এল, "চললুম আজ ধরণীর এই মরা প্রাণে চেতন দিতে—পাখীর খাঁচা ভেঙ্গে দিতে,—এই জগতের সুধার স্রোতের চুমুক নিতে। যেথায় যাবে যাও তুমি—দীঘীর জলের শেওলা তুমি বানের মুখে যাও ভেসে!"

এই ব'লে সে বেরিয়ে এল—বেরিয়ে এল লড়াই-ভরা প্রাণ-নিয়ে। কিন্তু আজ নেই সে আর মোদের মাঝে; জগতের সঙ্গে লড়াই ক'রে খতম হ'য়েছে সে আজ একটি বচ্ছর। হাজারো লড়াইয়ের প্রাণের জখম গুলো যখন সে আমাদের দেখাতো—তখন স্তম্ভিত হ'য়ে যেতুম—ভাবতুম এত ঘা খেয়ে প্রাণ তাজা থাকে কেমন ক'রে?

তবু তাজা ছিল সে—নিশীথের সঙ্গীহারা কিশোরীর ব্যথার মত তাজা—বুকের জখম মুখের হাসিতে ঢেকে তবু গান গেয়ে ফিরেছে সে।

আর কি সে জখম! জবার মত টক্ টকে—এক একদিন মনে হোতো আর বুঝি সে থাকবে না—সেই রাতেই তার জীবন-নিশা ফর্সা হবে। কিন্তু সকাল হতেই দেখতুম আবার চলেছে সে ফুট-পাথ দিয়ে চাদরের নিশান উড়িয়ে—মুখে তার পিলু-বাঁরোয়ার আড়খেমটায় ডবল মার্চ্চের সেই গানটি। দোতলার জানালা খুলে দেখতুম আর লাজাঞ্জলির মত এক মুঠো সিগারেট তার মাথার উপর ছড়িয়ে দিয়ে বল্‌তুম, "যাও বীর! যাও চারণ! ফিরে এস নতুন দুর্গা জয় করে, মরা প্রাণে চেতন দিয়ে!"

ম্লান হেসে সে চলে যেত—তার গানের বাণে হেনে যেত পথের ধারের দুর্গগুলির রুদ্ধ দুয়ার। কোনো দিন চকিতে কোনো দুর্গপুরীর বদ্ধ বাতায়ন খুলে যেতো—কোনো বন্দিনী দুটি কালো চোখ আয়ত করে চকিতের মত চাইত। সেই দিনটা ছিল তার বিজয়ের দিন—গৌরবের দিন। মোল্লাপাড়ার বস্তি থেকে কালীঘাটের ঘাট অবধি যত দুর্গ সবগুলিকে চিন্‌ত সে।

জলে পচা একটা দিন অন্ধকারে ঝিমুচ্ছে। দেখলুম তাকে শ্রাবণধারার ঝর-ঝরানির তানে সুর মিলিয়ে সে তার সমরগাথা গাইছে বসে পটল ডাঙ্গার মোড়ে। তখন প্রভাত। সন্ধ্যায় ফিরলুম যখন, তখনো-তার গান থামে নি।

আমায় দেখে ফিরে এল বীর, চোখের জলে ভাঙা সুরে বল্‌লে, "দুর্গ-দুয়ার আজো খুল্‌লে না! আজ সাত দিন—হায় বন্দিনী!" বুঝ্‌লুম আজ নতুন জখম—হায় চারণ!

মুখে বল্‌লুম, "ধরণীর সব যোদ্ধার সেরা তুমি—তোমার নাম লেখ

রবে সবার আগে—ভেবো না।" শুধু হেসে বল্‌লে সে, "জান কবুল বন্ধু, তবু ভাঙ্‌ব আমি দুর্গ-দুয়ার-ভাঙ্‌ব হে!"

হি হি শীতে জগৎ কাঁপে—তবু চলে চারণ সেই পথে—তার সমর-গাথায় বুক তাতিয়ে—সেই গলির মোড়ে মায়ালোকের স্বপন-মাখা দুর্গপুরীর দুয়ারপথে ব'সে তারি গান গায় চারণ!

পাষাণপুরী টলে না। মনের বনে আগুন দিয়ে ফাগুন আসে—বীর সে ফাগুন, হেথায় সেথায় মাছির ঝাঁকের সমর গুজন, ধূলির বাণে চক্ষু হানে। চারণ তার সেতারখানায় তার লাগায়—নতুন তার। বলে হেসে, "চল্‌ছি সখা আজ ফাগুন সাথে দিগ্বিজয়ে।"

আবার সেই গলির মোড়ের স্তব্ধ বাড়ী—দুর্গপুরী।

সেদিন যেন একটুখানি আওয়াজ আসে—বন্দী নারীর ঝিঁঝিঁর বাজে—তারি আওয়াজ। চারণের সমর-গাথায় পাষাণ-পুরী বুঝি টলে!

সন্ধ্যা হ'তে খুল্‌ল দুয়ার—দুর্গপুরীর পাষাণ দুয়ার। "জয় করেছি! জয় করেছি!" চেঁচিয়ে ওঠে বীর চারণ, তার পরেই সাম্‌নে চেয়ে শিউরে উঠে- দুচোখ ঢাকে, হায়—হায়। তার নিজের নারী! কোলের বীণা ধূলোয় লোটে—ফিরে আসে নত শিরে আঁধার পথে।

সেই তার শেষ জখম, তার পানে চাইতে চোখে জল এল।

শেষ জখমের বিষের জ্বালায় মোদের পথে বীর চারণের গান ফুরুল—চ'লে গেল সেই নিশীথেই মেল ট্রেণে—কোন্ সুদূর দেশে—অচিন্ লোকে নতুন জয়ের মায়ার টানে।

যুগরাজ

গৃহিণী একটু দুধ ঘি খাইয়া তাজা হইতে বাপের বাড়ী গিয়াছিলেন। এই ফাঁকে মাস কয়েকের ছুটি লইয়া জমি-জমার একটা ইজারা বন্দোবস্ত করিতে দেশে গিয়াছিলাম। শ্রীমান্ হরিকুমারের সংবাদ রাখিতে পারি নাই। কিন্তু বাসায় পা দিতেই হরিকুমারের তাগিদ আসিয়া পৌছিল; স্নানাহার করিয়া টলিতে টলিতে কেবল দোতলার সিঁড়িতে দাঁড়াইয়াছি এমন সময় দরজায় কড়ানাড়া শুনিলাম,—নামিয়া দরজা খুলিলাম; সবুজ উর্দ্দী পরিহিত ঢল ঢল গোছের একটি ছোকরা একখানি সবুজ খামের চিঠি দুই হাত জোড় করিয়া অঞ্জলি দিবার ভঙ্গীতে আমার হাতে দিয়া কহিল, "দয়া ক'রে আস্‌বেন একবারটি কি?"

খাম এবং পত্রবাহককে দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম বার্ত্তা হরিকুমারের; কহিলাম, "যাব, তবে এখন নয়, বোলো যে ট্রেণ থেকে নাম্‌ছি।" অজন্তার গুহায় আঁকা মূর্ত্তির ভঙ্গীতে ঘাড় বাঁকাইয়া নমস্কার করিয়া ছেলেটি চলিয়া গেল। পত্রখানি পড়িলাম,—

"নেই আপনি শুনলুম। আজ আস্‌বেন তাও শুনলুম। সত্যি ক'রে এসেই যদি থাকেন, তবে শূন্য বাড়ীটা আগলে ব'সে থাক্‌বেন না শুধু, এ মুখো আস্‌বেন একবার, কর্পোরেশনের বাছাইতে দাঁড়িয়েছি নিতান্ত মনের তাগিদে। স্পষ্ট জান্‌বেন সব—যদি আসেন।

—কুমার।"

মনে মনে একটু খুসী হইলাম, যাহোক—সংসারের দিকে শ্রীমানের চোখ পড়িয়াছে। বস্তু পৃথিবীর মায়া ক্রমে ক্রমে শিকড় গজাইতেছে ইহা নিশ্চিত শুভলক্ষণ।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে একটা বর্ম্মা চুরুটে অগ্নিসংযোগ করিয়া ধূম্রোদ্গম করিতে করিতে বাহির হইলাম। দেখিলাম, কলিকাতা সহরের চেহারা এক-দম বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। চারিদিকে লাল পতাকা আর নানা রঙের পোষ্টার; পড়িয়া বুঝিলাম, দেশে অনেক নূতন দেশসেবকের আবির্ভাব হইয়াছে। সকলেই দেশসেবার মূল্যস্বরূপ ভোট ভিক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের কাহারও নাম ইতিপূর্ব্বে শুনি নাই; কিন্তু তাই বলিয়া সে দোষ তাঁহাদিগকে দিতে পারি না, ছয় মাস অনুপস্থিত ছিলাম, কলিকাতার সংবাদ রাখিতাম না। এই দীর্ঘকালের মধ্যে সামান্য পাঁচ সাত গণ্ডা স্বদেশ-সেবকের উৎপত্তি এই উর্ব্বর দেশের পক্ষে অসম্ভব মনে করিলাম না।

হরিকুমারের বাসার রাস্তায় যখন পৌঁছিলাম তখন বেলা ৪টা। ভাবিয়াছিলাম, হরিকুমারও বোধ করি দেশসেবকদের ধরণে দেয়ালে 'বিনীতভাবে ভোট-ভিক্ষা' করিতেছে, তাহার চেলা চামুণ্ডারাও হয়তো রাবিশ ফেলা লরী বোঝাই করিয়া সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে সমস্বরে

প্রতিদ্বন্দ্বীর পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধের মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে ; কিন্তু তাহার কিছুই দেখিলাম না। ক্ষণকালের জন্য মনে হইল ব্যাপারটার আগাগোড়া সমস্তই বোধ হয় হরিকুমারের কল্পনা। ফিরিয়া যাইব কি না ভাবিতেছি, এমন সময় পাশের চায়ের দোকান হইতে জরিদার স্লিপার পায়ে একটি তরুণী বাহির হইয়া আসিয়া আমার সম্মুখে নীরবে দাঁড়াইলেন। বিস্মিত হইয়া চাহিতেই তিনি কহিলেন—"আমাদেরি তো আপনি? আসুন, এক চুমুক দিয়ে যান।"

আমতা আমতা করিয়া কহিলাম, "বুঝতে পাচ্ছিনে তো—।" তরুণী আমার হাত ধরিয়া কহিলেন, "বুঝতে না পারাই তো মনের ধর্ম্ম। আসুন, বোঝাই আপনাকে।"—এই বলিয়া আমাকে এক রকম টানিয়া লইয়াই চলিলেন। একটু ভয় হইল, কিন্তু কেন যেন হাত ছাড়াইয়া লইতেও ইচ্ছা করিল না। তরুণীর পশ্চাতে একটি ঘরে গিয়া ঢুকিলাম। ঘরে একটি টেবিলের চারি পাশে ঘিরিয়া অনেকগুলি তরুণী আমাকে দেখিয়াই তাঁহারা সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এতগুলি তরুণীকে একত্রে দেখিয়া আতঙ্ক অনুভব করিতে লাগিলাম। বাহিরে যাইবার দরজাটা কোনদিকে দেখিবার জন্য পিছনে চাহিতেছি ; এমন সময় একটি তরুণী সিরাপের এক গ্ল্যাস লাল সরবৎ আমার মুখের কাছে আনিয়া ধরিয়া কহিলেন, "এই টুকুতেই শুকিয়ে উঠলেন আপনি? আমরা নিতান্তই আপনার আপনজন তাকি জানেন না? এই ইট-কাঠের সহরে নূতন যুগের সঞ্চার হচ্ছে। সেই যুগরাজের মঙ্গল কামনায় একটি চুমুক দিন্।" যুগরাজের মঙ্গল কামনা অপেক্ষা ত গৃহিণীর মঙ্গল কামনা করা অবস্থা বিবেচনায় সঙ্গত মনে করিয়া এক চুমুকে সরবতটুকু নিঃশেষ করিলাম। ঠিক এই সময় শাড়ীর আঁচল

গলায় জড়াইয়া তরুণীরা সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "যুগরাজের জয় হোক, দীর্ঘজীবী হোক্ নবযুগ।"

ফুটপাথ হইতে উচ্চতর শব্দে এই চীৎকারের প্রতিধ্বনি শুনিয়া মুখ ফিরইয়া দেখি তরুণ-তরুণীর একটি প্রকাণ্ড দল বোটানিক্যাল গার্ডেনের যাবতীয় গাছের ভাঙ্গা ডাল নিশানের মত দোলাইতে তালে তালে পা ফেলিয়া আমাদের কক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছে। একটু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখি দলের মধ্যে শ্রীমান্ হরিকুমার, তাহার হাঁতে একটি শতদল পদ্ম, চোখ দুটি আগেকার মত ঢুলু ঢুলু, চুল আরও কিছু বাড়িয়াছে, তাহার চারিপাশে 'বাস্তবিকার সদস্য আর সদস্যাগণ। সকলের গলারই একটি করিয়া মালা। চকিতের জন্য মনে হইল হরিকুমার বোধ হয় বরযাত্রী হইয়া যাইতেছে। দুই পা অগ্রসর হইয়া গেলাম। হরিকুমার আসিয়া চশমাটি নাকের ডগায় লাগাইয়া কহিল,—"একা? হায়! বৌদিকে পেতাম যদি আজ! আজ এই—"

বাধা দিয়া কহিলাম,—"তুমি আছ কেমন? বর যাত্রী চলেছ নাকি?"

হরিকুমার তাহার স্বাভাবিক স্বরে কহিল, "চলেছি বটে, তবে কোনো হতভাগ্য মানবের বধূর পিত্রালয়ের পথে নয়, নবযুগের যাত্রার পথে। সেখানেও একটা মিলন আসন্ন, এই বেদনার বস্তুজগৎ আর মনের আনন্দ-লোক—দুটির হাতে বাঁধা হবে গাঁটছড়া, আর তাদের মিলনে জন্মাবে একটা যুগ-শিশু নূতন শুভ্র অনাবিল পুলক-চঞ্চল।"

বুঝি না বুঝি, হরিকুমারের তত্ত্বব্যাখ্যান বরাবর ধৈর্য্যসহকারেই শুনিয়া থাকি; আজও শুনিলাম। বক্তৃতার শেষের দিকে জিজ্ঞাসা করিলাম,

"নবযুগের কথাটা আর একদিন শুনিও হরি, আপাততঃ কর্পোরেশন ইলেক্‌শনের ব্যবস্থা কি করেছ বল ?"

হরিকুমার চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "অবাক্ হলুম ; বোঝেননি এত ক্ষণেও কি ? আপনি কি ভাবছেন আমরা এই জগতের মানুষের মতই ভোট চেয়ে বেড়াব ? দিকে দিকে লাল নীল নিশান উড়িয়ে আর পোষ্টার ছেপে ? আমাদের আয়োজন আমাদেরই মতন। এই দেখুন, নিশান আমাদের—শ্যামপর্ণ তরুশাখা গুলো—আমাদের ধরিত্রীর দান। আমার হাতের এই আধফুটন্ত পদ্মটি—এইটিই আমাদের যা বলবার কথা বল্‌ছে—মামুলী ম্যানিফেষ্টোর চেয়ে বল্‌ছে ঢের বেশী কথা !"

কহিলাম, "আমাকে একটু স্পষ্ট ক'রে সব বল্‌তে হবে। আমাকে যদি কিছু কর্ত্তে হয় তবে তোমার উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট বুঝতে হবে। আমি আমার ধরণে লোকজনকে বোঝাব।"

হরিকুমার উদাসভাবে কহিল, "কুমারের জীবনের উদ্দেশ্য, কর্ম্মের লক্ষ্য নতুন ক'রে বুঝতে হ'বে আপনাকে! তবে বুঝুন। আমি এ ব্যাপারে আস্‌তুম না, শুধু প্রাণের তাগিদে এলুম। বুঝি আমি ভাল করেই যে, সহরের এই যে রূপ, এই যে গতি—এ মানবের অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে চল্‌ছে। মানব-মনের সৃষ্টিধারার সঙ্গে এর যোগ নেই। তাই সহরের নূতন রূপ দিতে চাচ্ছি আমি। জানি না, মানব-মনের চাহিদার সঙ্গে যোগ রেখে নতুন করে সহর গড়বার অধিকার সহরের লোক আমাকে দেবে কি না। যদি দেয়, তবে নতুন সহরের সৃষ্টি হবে—এই

পদ্মটি হচ্ছে সেই সৃষ্টির প্রতীক।” দলশুদ্ধ তরুণ তরুণী ‘আহা’ ‘আহা’ করিয়া উঠিলেন। ভাল করিয়া বুঝিতেছিলাম না, কহিলাম, “কি কর্ত্তে চাও, ট্যাক্স কমাবে?”

হরিকুমার কহিল, “ট্যাক্স! ট্যাক্সের সঙ্গে সম্পর্ক কি? ট্যাক্সের কি প্রয়োজন? যে দিক দিয়ে নূতন সহরের সৃষ্টি, সেদিকে টাকা পয়সার কথা নেই। কল্পনা করুন কি হতে পারে। ভাবুন মনে দেখি চৌরঙ্গীর পথের ধারের বাড়ীগুলো গুঁড়ো করে চ’ষে, সেখানে যদি সারি সারি কৃষ্ণচূড়ার গাছ লাগিয়ে দিই, গঙ্গার থেকে খাল করে একটা শুভ্র চঞ্চল জলধারা যদি বড়বাজার আর হ্যারিসন রোডকে লুপ্ত করে শেয়ালদা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত কলকল্লোলে ছুটে আস্‌তে থাকে আর ট্রামের ঘর্ঘর রবকে চিরকালের মত নিস্তব্ধ করে ময়ূরপঙ্খী পান্‌সীগুলো তালে তালে দাঁড় ফেলার শব্দে দুই তীর চকিত করে যাত্রী নিয়ে মন্থর গতিতে চল্‌তে থাকে, তবে কেমন হয়? লালবাজারের পুলিশ ব্যারাক উপড়ে ফেলে বিন্ধ্য আর হিমালয় থেকে পাষাণ এনে যদি একটা বিরাট ধূসর গিরিমালার সৃষ্টি করি, আর তার মধ্যে গুহা সৃষ্টি করে ব্যারাকের জীবগুলোকে তার মধ্যে স্থান দিই, আর আজকের কর্পোরেশনের ঐ কুৎসিত রঙের দালান ক’টিকে মাটিতে মিশিয়ে তার উপর বেণু আর বনবেতসের কুঞ্জ রচনা করি, ফুটপাতের তপ্ত পাথরগুলোকে তুলে সেখানে স্নিগ্ধ-শ্যাম তৃণের আচ্ছাদন বিছিয়ে দিই, তবে কেমন হবে দেখতে বলুন তো? সমস্ত ব্যাধির জন্মস্থান ঐ ডাক্তারী ইস্কুলগুলোকে ধ্বংস করে সেখানে সর্ব্বৌষধির উদ্যান বসিয়ে দিই যদি, তবে কি জগতের অকল্যাণ হবে?” আমি হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলাম। দল শুদ্ধ আবার কহিয়া উঠিল, “ধন্য হবে, ধন্য হবে!”

"শুধু ধন্য নয় শোভন হবে, সম্পূর্ণ হবে! আমি কল্পনার চোখে দেখছি, আর আমার অন্তরের মর্ম্মকোষ বেয়ে আনন্দরস গড়িয়ে পড়ছে! দেখছি ক্লাইভ ষ্ট্রীটের ব্যাঙ্কপল্লীটি হ্রদে পরিণত হয়েছে, তার নীলজল দখিণায় মৃদু তরঙ্গিত, আর চাঁদনীর বিস্তৃত পণ্যপল্লীতে একটি দেবদারু বন, আর সেখানে অজযূথ আনন্দে বিচরণ কর্চ্ছে! মিউনিসিপাল মার্কেটের অনাবশ্যক কামরাগুলোর স্থানে জন্মেছে একটি চন্দন অটবী, সেখানে একদল শ্বেতবরাহ নির্ভয়ে ঘুৎকার কর্চ্ছে। লোয়ার সারকুলার 'রোড"—বলিয়া হরিকুমার একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। তাহার পর আবার বলিতে লাগিল, "লোয়ার সারকুলার রোডটির দুধারের বাড়ীর স্থানে নবনীপশ্রেণী, আর পথের দীর্ঘ বিস্তারটি কেশরের গালিচায় আবৃত হয়ে কার যেন পদসঞ্চরণের অপেক্ষা কর্চ্ছে!" হরিকুমার আবার থামিয়া গেল, চোখ দুটিও একটু উজ্জ্বল হইল, ঐ পথটির কোন স্থানে একটু গোলযোগ আছে মনে করিয়া প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে কহিলাম, "এ সব তো এ যুগে সম্ভব হবে না হরি।"

হরিকুমার উত্তেজিত হইয়া কহিল, "হবে, হবে! সত্য যা' তা সম্ভব হবে না কি? মানবের মনের ক্ষুধা যে জিনিষটার কামনা কর্চ্ছে, আমরা আমাদের সকল শক্তি দিয়ে তাই দিতে চাই তাকে। তাই এই সহরের নিয়ন্তা হ'তে চাই—বাস্তবিকার সকল সদস্যই আজ সত্যিকার সহর গড়বার সঙ্কল্প নিয়ে দাঁড়িয়েছেন। যদি পারেন সাহায্য করবেন আমাদের।"

ক্লাইভ ষ্ট্রীটে পুষ্করিণী খুঁড়িবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে কিরূপ সিদ্ধিলাভ হইবে তাহা জানিতাম। কহিলাম, "তোমার সঙ্কল্পের কথা আপাততঃ প্রকাশ না করে সাদা কথায় ভোট চাও, কাজ হবে।"

হরিকুমার মাথার চুলের মধ্যে আঙ্গুল চালাইয়া কহিল, "এর চেয়ে সাদা কথা আর জানিনে। যদি এই কথাটুকু বুঝতে আজ আমার প্রতিবেশীরা না পারেন তবে বল্‌ব তাঁরা দুর্ভাগ্য। বাস্তবিকার মঙ্গল কামনা কর্ব্বেন আশা করি।"

কহিলাম, "একশো বার। হরি তবে আসি।" বাহির হইয়া আসিলাম। ফুটপাথে নামিয়াই দেখিতে পাইলাম, সম্মুখের দিক হইতে তিন চারখানা গরুরগাড়ী বোঝাই করিয়া কতকগুলি ডালপালা লইয়া একদল তরুণ ও তরুণী পথের দু'ধারে ফুল ছড়াইতে ছড়াইতে আসি--তেছেন, আর সমস্বরে চীৎকার করিতেছেন,—

"জয় জয় নবযুগ !

জয় জয় হোক যুগরাজ !"

বুঝিলাম, হরিকুমারের দলও কম যায় না; কিন্তু কর্পোরেশনে ঢুকিলে সহরের অবস্থাটা কি হইবে তাহা ভাল করিয়া ভাবিয়া উঠিতে পারিলাম না। একটা চুরুট ধরাইয়া বাসার দিকে ফিরিয়া চলিলাম।

কুমার-রাজ্য

হরিকুমার কর্পোরেশন ইলেকসনে দাঁড়াইয়াছিল শুনিয়া সুখী হইয়াছিলাম ; নির্ব্বাচনের ফল শুনিয়াও যে বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি তাহা বলা যায় না ! কিন্তু আজ যে সংবাদ শুনিলাম, তাহাতে একটু কষ্ট হইল। হরিকুমার কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছে, বাস্তবিকার সদস্য ও সদস্যাগণ সকলেই তাহার অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। সকালের ডাকে একখানি পত্র পাইয়াছি—

"সহর ছাড়লুম। কোথায় যাচ্ছি জানিনে তা। তবে এইটুকু জান্‌বেন যে আপনাদের সমাজ থেকে এই আমার মহাপ্রস্থান।"

শেষের কথাটি শুনিয়া গৃহিণী শিহরিয়া উঠিয়া কহিলেন "বালাই ষাট্।" তাহার পর আমার হাত ধরিয়া কহিলেন, "আমার মাথা খাও, তুমি একটু খবর কর।"

কোথায় খবর করিব স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। অনেক ভাবিয়া বাহির হইলাম। বাস্তবিকার যে দুই একজন সদস্যের বাড়ীর ঠিকানা জানা ছিল তাঁহাদের সকলের বাড়ীতে গিয়া দেখিলাম সোরগোল

কান্নাকাটি পড়িয়া গিয়াছে। সকলেই এক এক ছত্র চিঠি পাঠাইয়াছেন—"মহাপ্রস্থানে চলেছি। খোঁজ করবেন না কেউ।" খামগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম একই তারিখে পোষ্ট করা। পোষ্টাফিস বড়বাজার। বুঝিলাম সকলেই যাইবার মুখে চিঠি ডাকে দিয়া গিয়াছেন। হাওড়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিলাম। চিঠির তারিখে একদল তরুণ ও তরুণী কোন্ ষ্টেশনের টিকেট কিনিয়াছেন কেহ বলিতে পারিল না। ফিরিয়া আসিলাম। গৃহিণী একখানা চিঠি দিলেন, রাখন মাসী মাথার দিব্য দিয়া হরিকুমারের সংবাদ পাঠাইতে লিখিয়াছেন। মাথায় খুন চাপিয়া গেল। কেবল ছয়মাস ছুটির পর আসিয়া কাজে লাগিয়াছি এখন তাঁহার দুলালের পিছনে হৈ চৈ করিয়া বেড়াই আর কি! একখানা পোষ্টকার্ড লইয়া অত্যন্ত কড়া কয়েকটি কথা লিখিব ভাবিতেছি এমন সময় গৃহিণী আসিয়া বাধা দিয়া কহিলেন,—"যা তা লিখনা লক্ষ্মী, মায়ের প্রাণ!" অগত্যা মায়ের প্রাণের খাতিরে সংক্ষেপে জানাইলাম যে, হরিকুমার বেড়াইতে বাহিরে গিয়াছে, কোথায় গিয়াছে সংবাদ পাই নাই—সংবাদ পাইলে জানাইব।

ইতিমধ্যে হরিকুমারের মেসের ঝির সন্ধান লইবার জন্য চোরবাগানের বস্তি খুঁজিয়া আসিলাম। পশ্চিমে জানাশোনা বন্ধুদের কাছে পত্র লিখিলাম। সঠিক্ খবর কোথাও পাইলাম না। সপ্তাহখানেকের মধ্যে রাখন মাসীর তিনখানা পোষ্টকার্ড আসিল, একই জবাব দিলাম। পরের সপ্তাহে বেয়ারিং চিঠি আসিতে লাগিল। বুঝিলাম বুড়ীর সম্বল ফুরাইয়াছে। কি করি স্থির করিতে না পারিয়া পুলিশে খবর দেওয়াই সুযুক্তি মনে করিলাম। আপিস হইতে ফিরিয়া সেই অভিপ্রায়েই বাহির

হইতেছিলাম এমন সময় হরিকুমারের ছোক্‌রা চাকরটি মাথার মিলিটারী ক্যাপ খুলিয়া কুর্ণিশ করিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে কিছু প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই সে বুকপকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া পুনরায় কুর্ণিশ করিল। চিঠি লইলাম। ছোকরাটি মিলিটারী ভঙ্গীতে রাইট এবাউট্‌ টার্ণ করিয়া চলিয়া গেল।

বলা বাহুল্য পত্রখানি হরিকুমারের। ঘরে ঢুকিয়া পত্রখানি খুলিলাম। চিঠিখানার মাথায় Crossed Swordএর আদর্শে দুইটী দীর্ঘ বৃন্ত গোলাপের ছবি ও তাহার নীচে সোণার জলে ছাপা একটি মুকুট। চিঠিতে লেখা—

"দূতমুখে সংবাদ শুনলুম হিতৈষীরা আমাকে খুঁজ্‌ছেন। ব্যর্থ অন্বেষণ। সহরে তো পাবেন না আমাকে আর। সহর যাকে ত্যাগ করেছে তাকে আশ্রয় দিয়েছে এই পর্ব্বতের উপত্যকা। তারি বুকে আমার নবরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছি। এ রাজ্য সুন্দরের। আপনি আস্‌তে পারেন। আমার স্বাক্ষর দেখাবেন, রক্ষীরা বাধা দেবে না।" পত্রনিম্নে স্বাক্ষর 'কুমার রাজ।' হরিকুমার এনার্কিষ্টের দলে ভিড়িল নাকি! মাথা ঘুরিয়া উঠিল, গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলাম। গৃহিণী আসিয়া চিঠিখানা দেখিয়া কহিলেন, "ধন্যি ছেলে সত্যি! আমি তো বরাবরই বলেছি হরি এমন কিছু কর্ব্বে যাতে—"

আমি অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়া কহিলাম, "হুঁ যাতে নদে জেলার সবগুলো মানুষকে আন্দামান যেতে হয়। ছিঁড়ে ফেল চিঠি।"

গৃহিণী কহিলেন, "কেন ভাব্‌ছ? আগে গিয়ে দেখে এস না কেন? আমি সঙ্গে যাচ্ছি ভয় কি?" কথা কহিলাম না। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া

গৃহিণী কেবল হরিকুমারের স্তুতি গাহিতে লাগিলেন। কোন ক্রমে রাত কাটাইয়া চিঠিখানা পকেটে ফেলিয়া হাওড়া ষ্টেশনে চলিলাম। চিঠিতে পথের সন্ধান দেওয়া ছিল, খুরদার টিকিট কিনিয়া উঠিলাম।

পরদিন ষ্টেশনে নামিতেই সৈনিকবেশধারী জনপাঁচেক তরুণ আমাকে ঘিরিয়া ধরিল। সকলের টুপিতেই যুগল গোলাপ চিত্রিত দেখিয়া বুঝিলাম যে ইহারা হরিকুমারের ফৌজ। পকেট হইতে চিঠি বাহির করিলাম। চিঠি দেখিয়া সৈনিকের দল সসম্ভ্রমে আমাকে অভিবাদন করিল। কহিলাম "কোথায় যেতে হবে?"

একজন কহিলেন, "সে জবাব দিতে পার্ব্ব না। চলুন।"

ষ্টেশনের বাহিরে ছয়টি খচ্চর ঘাস খাইতেছিল। সৈনিক পাঁচজন আমাকে ধরিয়া একটির পিঠে চাপাইয়া দিলেন। আমি কাঁপিতে কাঁপিতে বাহনটির কান টানিয়া ধরিয়া মনে মনে রাখন মাসীর বাপান্ত ও গৃহিণীর পিতামহের শ্রাদ্ধের মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে চলিলাম। সৈনিকেরা দল বাঁধিয়া আমার সম্মুখে গাহিতে গাহিতে চলিলেন,

"আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরি!"

দীর্ঘ পথ। গান সমানে চলিতে লাগিল। কত কথাই ভাবিতে ভাবিতে চলিতেছিলাম। সহসা সৈনিকেরা সমস্বরে কহিয়া উঠিলেন, "হল্ট।" ছয়টি চতুষ্পদ কাণ খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া ধুঁকিতে লাগিল। নামিলাম! সম্মুখে সারি সারি বন ঝাউ! তাহার পিছনে ছোট ছোট পাহাড়ের সারি। তাহার একটির মাথায় সবুজ রংএর একটি পতাকা উড়িতেছিল! একজন সৈনিক কহিল, "ঐখানে। চলুন।"

পায়ে হাঁটিয়া চলিলাম। পিছনে অশ্বতর কয়টি পোষা কুকুরের মত আসিতে লাগিল। ঝাউবন পার হইয়া প্রকাণ্ড একটি প্রান্তরে আসিয়া পৌছিলাম। সারি সারি শালপাতার ছাউনী কুটীর, তাহার সম্মুখে লোকজনের জটলা, দুই একটি চেনা মুখও দেখিলাম। অত্যন্ত শ্রান্ত বলিয়া নাম মনে করিয়া উঠিতে পারিলাম না। পথে দুই একজন আমাকে অভিবাদন করিলেন। প্রত্যভিবাদন করিলাম। এমন সময় ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। একজন সৈনিক কহিল, "রাজসভা আরম্ভ হ'ল।" বিব্রত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "জায়গাটার নাম কি?" সৈনিক কহিল, "কুমার নগর। কুমার রাজ্যের রাজধানী।"

সবুজ পতাকার নীচে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে অনেকগুলি লোক বসিয়া, তাহাদের সম্মুখে পতাকা-মূলে বেদী। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম সেকালের মতই পাতার মুকুট মাথায় বেদীর উপর হরিকুমার বসিয়া। গলায় স্বর্ণলতার মালা, হাতে একটি পলাশের পুষ্পিত শাখা—বুঝিলাম সেটি রাজদণ্ড। আমাকে দেখিয়া হরিকুমার উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "অসীম আপনার মমতা। কত গিরি মরুপ্রান্তর পার হ'য়ে এসেছেন, স্বাগত!" স্থান কাল বিবেচনায় মাথা নীচু করিলাম। হরিকুমার কহিল, "আসন গ্রহণ করুন।"

বসিলাম। হরিকুমার আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "বিস্মিত হচ্ছেন আপনি নিশ্চয়। কিন্তু বিস্ময়ের কোনো কারণ সত্যই আছে কি? আমার মনে অনেক দিন থেকেই ঘনিয়ে উঠ্‌ছিল একটি রাজ্যপ্রতিষ্ঠার কল্পনা, তা হয় তো জান্‌তেন। কর্পোরেশনে সেই জন্যেই দাঁড়িয়েছিলুম। কিন্তু দেখ্‌লুম সহর এখনও আমাকে গ্রহণ কর্ব্বার জন্যে তৈরী হ'য়ে উঠ্‌তে পারেনি। তাই শুক্‌নো মালাটির মত চিরদিনের জন্যে তাকে ছাড়্‌লুম।

আর মনের গোপন সৃষ্টির কল্পনাকে রূপ দিলুম এখানে এসে—এই গিরি আলিঙ্গিত উপত্যকাবালাটির অঙ্কে। মনের কামনাকে আজ বস্তু পৃথিবীতে টেনে এনেছি। ঐ দূরে সারি সারি কুটীর—এরা এই নগরের অধিবাসী। আপনাদের সঙ্গে তফাৎ এদের এই—এদের ট্যাক্স যোগাতে হয় না।"

হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া ফেলিলাম, "চলে কি ক'রে ?"

হরিকুমার কহিল, "প্রশ্নটি জটিল, তবে মীমাংসাও এর আছে। এর জবাব দেবেন কুমাররাজ্যের অর্থসচিব শ্রীযুক্ত চকিত চাকী। হাস্‌ছেন ? হাস্‌তে .পারেন আপনারা, হিসেবের খাতা লিখ্‌তে লিখ্‌তে কড়াগণ্ডার দাগে প্রাণে কড়া পড়ে গেছে আপনাদের। কাজেই বিদ্রূপ ছাড়া আপনাদের কাছে প্রত্যাশার কিছু নেই। তবে জান্‌বেন এও সত্যি, টাকা-পয়সার লেন-দেন ছাড়াও চলে—আপনাদের রাজ্যে চলে না—কিন্তু এখানে চলে। চল্‌বেও।"

ক'হিলাম, "তাহ'লে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগ রাখনি বোধহয় ?"

হরিকুমার কহিল, "সে কথা ভাব্‌বেন না মোটেই। যোগ রেখেছি। বর্ত্তমানকে একেবারে ছেঁটে দিইনি। বর্ত্তমান থেকে যতটুকু নেবার আছে, নিয়েছি। বিলিতি ক্যাবিনেট থেকে কর্ম্মবিভাগের ধারাটুকু নিজেদের প্রয়োজনের অনুরূপ করে নিয়েছি। প্রতিবিভাগের স্বতন্ত্র কর্ম্মনায়ক আছেন তবে যুগলে। তাঁরা সচিব। অর্থসচিব চকিত চাকী ও কুমারী নূপুর নাগ। আমাদের ধনাধ্যক্ষ। তবে সেধন আপনাদের তাঁবার অথবা রূপার চাকী নয়। তাঁদের সঙ্গে আলাপে বিস্তৃত বিবরণ পাবেন আপনি। পুষ্পসচিব কুমারী চিড়িয়া চক্রবর্ত্তী ও কুমার

নিমেষ নাগ। আপনাদের কাজ যেমন মানুষ নিয়ে এঁদের কাজ এ রাজ্যের ফুলের সঙ্গে; ফুলের প্রসবকাল থেকে তার শেষপাপড়ি ঝরা পর্য্যন্ত সব রকমের হিসেব এঁরা রাখেন। পক্ষী সচিব কুমার রাতুল রাহা ও কুমারী বলাকা বটব্যাল। বসন্ত সচিব কুমার গহন গুহ ও কুমারী ক্ষণিকা খাঁ। এ থেকে ভাববেন না যে শুধু বসন্ত ঋতুর প্রতি আমাদের কোনও পক্ষপাত আছে, সব ঋতুর জন্যেই যুগল সচিব আছেন; তাঁরা সেই ঋতুর মর্ম্মের উৎসব বাণী প্রচার করেন সবার কাছে।"

হরিকুমারের ব্যাখ্যান চিরকালই দুর্ব্বোধ্য, আজও বুঝিতেছিলাম না। তবে সকলের দেখাদেখি আমিও মাথা নাড়িতেছিলাম। এমন সময় তীব্র বংশীধ্বনি শুনিলাম। সভাস্থ সকলে একসঙ্গে উঠিয়া নিমীলিত নেত্রে সমস্বরে কহিলেন, "সদ্গতি হোক্!"

হরিকুমার আমার দিকে চাহিয়া কহিল, "আজ প্রথম এই রাজ্যে প্রাণ-দণ্ড হোল!"

শুনিয়া ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেলাম। গৃহিণীর কুপরামর্শ শুনিয়া শেষে খুনীর দলে পড়িতে হইল!

হরিকুমার সম্ভবতঃ আমার মুখভঙ্গী লক্ষ্য করিয়াছিল কহিল, "অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ড বিধান পছন্দ করিনি আমি কোনোদিনো। তবু আরো কিছু দিন তার প্রয়োজন আছে। আমার আপত্তি ছিল তবু বিচার, বিচার। কাজেই রাজার মাথাও:নত কর্ত্তে হ'য়েছে বিচারের বেদীমূলে। আসুন, হতভাগ্যের নিষ্প্রাণ দেহটিকে শেষ সম্বর্দ্ধনা জানাবেন।"

সকলে উঠিলেন। আমিও অগত্যা কম্পমান পদদ্বয়কে যথাসম্ভব সংযত করিয়া তাঁহাদের সঙ্গ লইলাম; কিছুক্ষণ পর একটি বেতঝোপের

অন্তরালে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সম্মুখে একটি উঁচু বেদী—সেটিকে আড়াল করিয়া একটি কালো পরদা—বুঝিলাম এটি ফাঁসীমঞ্চ। আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া চক্ষু বুঝিলাম।

হরিকুমার কহিল, "প্রত্যহের সত্য যা তাতে এত শঙ্কা কেন আপনার? আর এ মৃত্যু তো ন্যায়ের সোপান মাত্র—এতে কোনো দুঃখ, কোনো শোক নেই।" তারপর ফাঁসীমঞ্চের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "ন্যায় তোমাকে তার দণ্ডের যোগ্য মনে করেছে, আর তুমিও হাসিমুখে তা গ্রহণ করেছ; তোমাকে ধন্যবাদ! যে লোকে ক্ষুধা আছে কিন্তু আহারের প্রয়োজন নেই—যাও সেই আনন্দধামে মুক্তজীব!"

ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল, কালো পর্দ্দাটার দিকে চাহিতে পারিতেছিলাম না। অকস্মাৎ খট্ করিয়া শব্দ হইল, পর্দ্দা সরিয়া গেল। সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম সবুজ সিল্কের দড়িতে বদ্ধকণ্ঠ নির্গত জিহ্বা একটি কালো পাঁঠা একটা করবীর ডাল হইতে ঝুলিতেছে! হরিকুমার আমার দিকে ফিরিয়া কহিল, "হত্যার দণ্ড এ। এই প্রাণীটি লুব্ধ হ'য়ে একটা কচি ও কোমল কিশোরী মালতী লতাকে দন্তাঘাতে বিক্ষত করেছে—ফলে আজ সে লতাটি নিষ্প্রাণ, শুষ্ক। তার কচি কচি পল্লবগুলো যা দিয়ে সে নববধূটির মত আঁকড়ে ধর্ত্তে চেয়েছিল ওই কিশোর সহকার তরুটিকে সে নধর পল্লব-গুলো ঝরে পড়ে গেছে। লতাটিকে হত্যা করেছে এই হতভাগ্য প্রাণী। ন্যায়ের আহ্বানে তাই মৃত্যুলোকে পাঠিয়ে দিলাম একে। এর গতিপথ নির্ব্বিঘ্ন হোক্!"

সমবেত সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"স্বস্তি! স্বস্তি!"

খুনের মামলায় পড়িতে হইল না দেখিয়া অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলাম—চীৎকার করিয়া উঠিলাম, "হরিকুমারের জয় হোক্!"

হরিকুমার তাহার গলার মালাটি আমার গলায় পরাইয়া দিল। আনন্দে চক্ষু মুদিলাম।

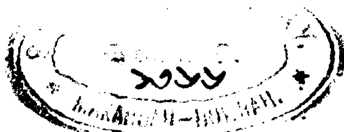
আত্ম-নিবেদন

যাহা বলিবার এক কথায় তাহা শেষ করিব।

লেখাগুলি বিদ্রূপাত্মক, তবে কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া নহে; হরিকুমার দিবাকর শর্ম্মার কল্পনাবিহারী একটি জীব মাত্র। ইতি—

মহালয়া, ১৩৩৮
কলিকাতা।

শ্রীগ্রন্থকার।



কল্যাণী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, ২০ রাজেন্দ্র লাল স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীশূলপাণি চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্ত্তৃক যুগবাণী সাহিত্য-চক্র, ১৪ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।